স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচিপত্র

১. ভারতের ধর্ম ও রীতিনীতিসমূহ.......................................4
২. বিশ্বমেলায় হিন্দুগণ.......................................9
৩. ধর্ম-মহাসভায়.......................................12
৪. বৌদ্ধ দর্শন.......................................13
৫. বদমেজাজী মন্তব্য.......................................13
৬. ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য.......................................16
৭. পুনর্জন্ম.......................................18
৮. হিন্দুসভ্যতা.......................................20
৯. একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা.......................................21
১০. হিন্দুধর্ম.......................................21
১১. হিন্দু সন্ন্যাসী.......................................24
১২. পরমত-সহিষ্ণুতার জন্য অনুনয়.......................................26
১৩. ভারতীয় আচার-ব্যবহার.......................................29
১৪. হিন্দু দর্শন.......................................33
১৫. অলৌকিক ঘটনা.......................................34

১৬. মানুষের দেবত্ব 35
১৭. ভগবৎপ্রেম 42
১৮. ভারতীয় নারী 45
১৯. ভারতের প্রথম অধিবাসীরা 47
২০. আমেরিকান পুরুষদের প্রতি কটাক্ষ 48
২১. উভয় দাহের তুলনা 48
২২. জননীগণ আরাধ্যা 49
২৩. অন্যান্য চিন্তাধারা 50
২৪. ধর্মে দোকানদারি 51
২৫. মানুষের নিয়তি 55
২৬. পুনর্জন্ম 59
২৭. তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব 62
২৮. 'এশিয়ার আলোক'—বুদ্ধদেবের ধর্ম 66
২৯. মানুষের দেবত্ব 68
৩০. হিন্দু সন্ন্যাসী 70
৩১. ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ 71
৩২. গতরাত্রের বক্তৃতা 72
৩৩. ধর্মের সমন্বয় 74

৩৪. সুদূর ভারতবর্ষ হইতে 77
৩৫. আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত একটি সন্ধ্যা........ 78
৩৬. ভারত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 82
৩৭. ভারতীয় আচার-ব্যবহার 82
৩৮. ভারতের ধর্মসমূহ........ 85
৩৯. ভারতের ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাস........ 86
৪০. উপদেশ কম, খাদ্য বেশী........ 87
৪১. বুদ্ধের ধর্ম 88
৪২. সকল ধর্মই ভাল 91
৪৩. তিনি ইহা অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন........ 93
৪৪. যোগীরা জাদুকর 94
৪৫. হিন্দু জীবন-দর্শন 94
৪৬. নারীত্বের আদর্শ 99
৪৭. প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম 103
৪৮. জগতে ভারতের দান 106
৪৯. ভারতের বালবিধবাগণ 110
৫০. হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি 112

১. ভারতের ধর্ম ও রীতিনীতিসমূহ

'সেলেম ইভনিং নিউজ', ২৯ অগষ্ট, ১৮৯৩

গতকল্য বিকালবেলায় আবহাওয়া খুব গরম থাকা সত্ত্বেও 'থট্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাব'-এর ('চিন্তা ও কাজ সমিতি') বেশ কিছু সভ্য-সভ্যা তাঁহাদের অতিথিগণসহ হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানোন্দের১ বক্তৃতা শুনিবার জন্য ওয়েসলি হলে জড়ো হইয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক এখন এই দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। বক্তৃতাটি ছিল একটি ঘরোয়া ভাষণ। প্রধান আলোচ্য বিষয়ঃ 'হিন্দুগণের ধর্ম—তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বেদে যেভাবে ব্যাখ্যাত।' বক্তা জাতিপ্রথা সম্বন্ধেও বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জাতি একটি সামাজিক বিভাগমাত্র, উহা ধর্মের উপর নির্ভর করে না।

বক্তা ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ভারতবর্ষের আয়তন অনেক ক্ষুদ্র হইলেও তথাকার জনসংখ্যা হইল ২৭ কোটি আর ইহাদের মধ্যে ৩ কোটি লোক গড়ে মাসে ৫০ সেণ্টেরও কম উপায় করে। দেশের কোন কোন অঞ্চলে লোককে মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একপ্রকার গাছের ফুল সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবনধারণ করিতে হয়। কোথাও কোথাও পরিবারের জোয়ান মরদরাই খায় ভাত, স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে ভাতের ফেন দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়। কোন বৎসর ধান না হইলে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। অর্ধেক লোক একবেলা খাইয়া বাঁচে, বাকী অর্ধেক একবার কোনমতে খাইতে পাইলে পরের বারে কোথায় খাবার জুটিবে, তাহা জানে না। স্বামী বিবে কিওন্দের মতে ভারতের অধিবাসিগণের প্রয়োজন অধিক ধর্ম বা উন্নততর কোন ধর্ম নয়, প্রয়োজন করিতকর্মা হওয়া। আমেরিকাবাসিগণকে ভারতের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ এবং অনশনক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যে উন্মুখ করিবার আশাতেই তিনি এই দেশে আসিয়াছেন।

বক্তা একটু বিশদভাবেই তাঁহার স্বদেশবাসিগণের অবস্থা এবং ধর্ম সম্বন্ধে বলেন। তাঁহার ভাষণের সময় মাঝে মাঝে সেণ্ট্রাল ব্যাপটিষ্ট চার্চের ডক্টর এফ. এ. গার্ডনার ও রেভারেণ্ড এস. এফ. নব্‌স্‌ খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। বক্তা উল্লেখ করেন, মিশনরীরা ভারতে অনেক দামী দামী কথা আওড়ান এবং শুরুতে অনেক হিতকর কল্পনাও তাঁহাদের ছিল, কিন্তু তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে দেশের লোকের শ্রমশিল্প-সংক্রান্ত উন্নতির জন্য কিছুই করেন নাই। তাঁহার মতে আমেরিকানদের কর্তব্য—ভারতে ধর্মপ্রচারের জন্য মিশনরীদের না পাঠাইয়া শ্রমশিল্পের শিক্ষা দিতে পারেন, এমন লোক পাঠান।

দুর্দৈবের সময় খ্রীষ্টান মিশনরীদের কাছে লোকে সাহায্য পায় এবং মিশনরীরা হাতেনাতে শিক্ষাদানের স্কুলও যে খোলেন, ইহা সত্য কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে বক্তা বলেন, কখনও কখনও তাঁহারা এরূপ করেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কোন কৃতিত্ব নাই, কেননা ঐরূপ সময় লোককে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা আইনতঃ নিষিদ্ধ বলিয়া ঐ চেষ্টা স্বভাবতই তাঁহাদিগকে বন্ধ রাখিতে হয়।

ভারতে স্ত্রীজাতির অনুন্নত অবস্থার কারণ—বক্তার মতে—হিন্দুদের নারীর প্রতি অত্যধিক সম্মান। নারীকে ঘরের বাহিরে যাইতে না দেওয়াই ঐ সম্মান রক্ষার অনুকূল মনে করা হইত। নারী সর্বসাধারণের সংস্পর্শ হইতে দূরে গৃহাভ্যন্তরে শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিতেন। স্বামীর সহিত চিতায় সহমরণ-প্রথার ব্যাখ্যায় বক্তা বলেন, পত্নী পতিকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া বাঁচিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিবাহে তাঁহারা এক হইয়াছিলেন, মৃত্যুতেও তাঁহাদের এক হওয়া চাই।

বক্তাকে প্রতিমাপূজা এবং জগন্নাথের রথের সম্মুখে স্বেচ্ছায় পড়িয়া মৃত্যুবরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, রথের ঐ ব্যাপারে হিন্দুদিগকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, কেননা উহা কতকগুলি ধর্মোন্মাদ এবং প্রধানতঃ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোকের কাজ।

বক্তা স্বদেশে তাঁহার কর্মপদ্ধতির বিষয়ে বলেন, তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষণের কাজে লাগাইবেন, যাহাতে জনগণ প্রয়োজনীয় কার্যকরী শিক্ষালাভ করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে।

আজ বিকালে বিবে কানোন্দ ১৬৬নং নর্থ ষ্ট্রীটে মিসেস উড্স-এর বাগানে ভারতবর্ষের শিশুদের সম্বন্ধে বলিবেন। যে-কোন বালক বালিকা বা তরুণরাও ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন। বিবে কানোন্দের চেহারা বেশ চমৎকার, রঙ কিছু ময়লা, কিন্তু প্রিয়দর্শন। কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধা পীতাভ লাল রঙের একটি আলখাল্লা তিনি পরিয়াছিলেন। মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ি। সন্ন্যাসী বলিয়া তাঁহার কোন জাতি নাই, সকলের সঙ্গেই তিনি পানাহার করিতে পারেন।

'ডেলি গেজেট ', ২৯ অগষ্ট, ১৮৯৩

ভারতবর্ষ হইতে আগত রাজা২ স্বানী বিবি রানন্দ গতকল ওয়েস্লি চার্চে সেলেমের 'থট্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাব'-এর অতিথিরূপে বক্তৃতা দিয়াছেন। বহুসংখ্যক ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত সন্ন্যাসীর সহিত আমেরিকান রীতিতে করমর্দন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল একটি কমলালেবু রঙের আলখাল্লা, উহার কটিবন্ধটি লাল। তিনি একটি পাগড়িও পরিয়াছিলেন। পাগড়ির প্রান্ত একদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। উহা তিনি রুমালের কাজে লাগাইতেছিলেন। তাঁহার পায়ে ছিল কংগ্রেস জুতা।

বক্তা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার দেশবাসীর ধর্ম ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয় বলেন। সেণ্ট্রাল ব্যাপটিষ্ট চার্চে ডক্টর এফ. এ. গার্ডনার এবং রেভারেণ্ড এস. এফ. নব্স্ বক্তাকে ঘন ঘন খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন। বক্তা বলেন, মিশনরীরা ভারতবর্ষে সুন্দর সুন্দর মতবাদ প্রচার করেন, গোড়াতে তাঁহাদের উদ্দেশ্যও ছিল ভাল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেশের লোকের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাঁহারা কিছুই করেন নাই। বক্তার মতে, আমেরিকানদের উচিত ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতে মিশনরী না পাঠাইয়া ভারতবাসীকে শিল্পবিজ্ঞান শিখাইবার জন্য কাহাকেও পাঠান।

ভারতে স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলিবার সময় বক্তা বলেন, তাঁহার দেশে পতিরা পত্নীর কাছে কখনও মিথ্যা বলে না এবং পত্নীর উপর অত্যাচারও করে না। তিনি আরও অনেক দোষের উল্লেখ করেন, যাহা হইতে ভারতের পতিরা মুক্ত।

বক্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এ-কথা সত্য কিনা, দৈবদুর্বিপাকের সময় ভারতের জনগণ খ্রীষ্টান মিশনরীদের নিকট সাহায্য পাইয়া থাকে এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য তাঁহারা স্কুলও চালান। উত্তরে বক্তা বলেন, কখনও কখনও মিশনরীরা এই ধরনের কাজ করেন বটে, তবে তাহাতে তাঁহাদের কোন কৃতিত্ব নাই, কেননা এরূপ সময়ে লোককে খ্রীষ্টধর্মে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে বন্ধ রাখিতে হয়, কারণ আইনতঃ উহা নিষিদ্ধ।

ভারতের নারীগণের দুর্দশার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বক্তা বলেন, হিন্দুরা স্ত্রীজাতিকে এত শ্রদ্ধা করে যে, তাঁহাদিগকে তাহারা বাড়ীর বাহিরে আনিবার পক্ষপাতী নয়। গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া নারী পরিবারের সকলের সম্মান লাভ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকের সহমৃতা হইবার প্রাচীন প্রথার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, পতির উপর পত্নীর এত গভীর ভালবাসা থাকে যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন-ধারণ করা পত্নীর পক্ষে অসম্ভব। একদিন উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পরও সেই সংযোগ তাঁহাদের ছিন্ন হইবার নয়।

প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে বক্তা বলেন, তিনি খ্রীষ্টানদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উপাসনার সময় তাঁহারা কি চিন্তা করেন? কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা গীর্জার কথা ভাবেন, কেহ কেহ বা ঈশ্বরের চিন্তা করেন। বেশ কথা। তাঁহার দেশে লোকে ভগবানের মূর্তির কথা ভাবে। দরিদ্র জনগণের জন্য মূর্তিপূজা প্রয়োজন। বক্তা বলেন, প্রাচীনকালে ভারতীয় ধর্মের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ে নারীরা আধ্যাত্মিক প্রতিভা এবং মানসিক শক্তির জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন। তবে বক্তা স্বীকার করেন, আধুনিক কালে তাঁহাদের অবনতি ঘটিয়াছে। খাওয়া-পরা গল্প-গুজব এবং অপরের কুৎসা-প্রচার ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা তাঁহাদের নাই।

বক্তা স্বদেশে তাঁহার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বলেন, একদল সন্ন্যাসীকে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশে কারিগরী শিক্ষাপ্রচারের উপযোগী করিয়া তুলিবেন। ইহা দ্বারা জনগণের অবস্থার উন্নতি হইবে।

‘সেলেম ইভনিং নিউজ’, ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

যে পণ্ডিত সন্ন্যাসীটি এই শহরে কিছুদিন হইল আসিয়াছেন, তিনি রবিবার সন্ধ্যা ৭/৩০-এ ইষ্ট চার্চ-এ বক্তৃতা করিবেন। স্বামী (রেভারেণ্ড) বিবা কানন্দ গত রবিবার সন্ধ্যায় এনিস্কোয়াম শহরে এপিস্কোপাল গীর্জায় ভাষণ দিয়াছিলেন। ঐ গীর্জার পাদ্রী এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট তাঁহাকে তথায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। অধ্যাপক রাইট এই আগন্তুক সন্ন্যাসীকে খুব সমাদর করিতেছেন।

সোমবার রাত্রে ইনি সারাটোগায় যাইবেন এবং ওখানে সমাজবিদ্যা সমিতিতে বক্তৃতা দিবেন। পরে চিকাগোর আগামী ধর্মসম্মেলনে তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা। ভারতে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, তাঁহাদের মত বিবা কানন্দও প্রাঞ্জল এবং শুদ্ধ ইংরেজী বলিতে পারেন। গত শুক্রবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি ভারতীয় শিশুদের খেলাধূলা, স্কুল এবং চালচলন সম্বন্ধে সরলভাবে যে মূল্যবান কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। একটি ছোট মেয়ে যখন বলিতেছিল যে, তাহার শিক্ষিকা একবার তাহার আঙুল জোরে চুষিতে থাকায় আঙুলটি প্রায় ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন বিবা কানন্দের দরদী হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ... স্বদেশে সকল সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহাকেও সত্য, শুচিতা ও সৌভ্রাত্রের ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া মহৎ কল্যাণকর যাহা, তাহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় না, আবার যদি কোথাও বিষম কোন অন্যায় ঘটে, তাহাও তাহার নজরে আসে। এই সন্ন্যাসী অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি অত্যন্ত উদার, কাহারও সহিত মতে মিল না হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে সদয় কথাই ইঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়।

‘ডেলি গেজেট ’, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

ভারত হইতে আগত রাজা স্বানী বিবি রানন্দ রবিবার সন্ধ্যায় ইষ্ট চার্চ-এ ভারতবর্ষের ধর্ম এবং দরিদ্র জনগণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। যদিও বেশ কিছু শ্রোতৃ জড়ো হইয়াছিলেন, তবুও বিষয়টির গুরুত্ব এবং বক্তার আকর্ষণের বিবেচনায় আরও বেশী লোক হওয়া উচিত ছিল। সন্ন্যাসী তাঁহার দেশী পোষাক পরিয়াছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ মিনিট বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আজিকার ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার ভারত নয়। ভারতবর্ষে গিয়া এখন মিশনরীদের ধর্মপ্রচারের কোন প্রয়োজন নাই। গুরুতর প্রয়োজন এখন লোককে কারিগরী এবং সামাজিক শিক্ষাদান। ধর্ম বলিতে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা হিন্দুদের আছে। হিন্দুধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। সন্ন্যাসী খুব মধুরভাষী। শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ তিনি বেশ ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

'ডেলি সারাটোগিয়ান ', ৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

... বক্তৃতামঞ্চে তাহার পর আসিলেন হিন্দুস্থানের মান্দ্রাজ হইতে আগত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। ইনি ভারতের সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ান। সমাজবিদ্যায় ইহার অনুরাগ আছে, এবং বক্তা হিসাবে ইনি বুদ্ধিমান্ চিত্তাকর্ষক। ভারতের মুসলমান রাজত্ব সম্বন্ধে ইনি বলিলেন।

অদ্যকার বক্তৃতাসূচীতে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আছে, বিশেষতঃ হার্টফোর্ডের কর্ণেল জেকব গ্রীনের আলোচ্য 'স্বর্ণ ও রৌপ্য–উভয় ধাতুর মুদ্রামান'। বিবে কানন্দ পুনরায় বক্তৃতা করিবেন। এইবার তাঁহার বিষয় হইবে–'ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার' ।

২. বিশ্বমেলায় হিন্দুগণ

'বষ্টন ইভনিং ট্রান্স্ক্রিপ্ট', ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

চিকাগো, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ

আর্ট প্যালেসের প্রবেশদ্বারের বামদিকে একটি ঘর আছে, যাহাতে একটি চিহ্ন ঝুলিতেছে—‘নং ১—প্রবেশ নিষেধ।’ এই ঘরে ধর্ম-মহাসম্মেলনের বক্তারা সকলেই মাঝে মাঝে, পরস্পরের সহিত অথবা সভাপতি মিঃ বনীর সহিত কথাবার্তা বলিতে আসিয়া থাকেন। মিঃ বনীর খাস দফতর এই গৃহেরই সংলগ্ন। ঘরের জোড়া কবাট সতর্ক পাহারা দ্বারা জনসাধারণ হইতে দূরে সংরক্ষিত, উঁকি দিয়া দেখিবার উপায় নাই। কেবলমাত্র মহাসভার প্রতিনিধিরাই এই ‘পুণ্য’ সীমানায় ঢুকিতে পারেন, তবে বিশেষ অনুমতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ যে একেবারে অসম্ভব, তাহা নহে। কেহ কেহ ঐরূপ ঢুকেন এবং খ্যাতনামা অতিথিদের একটু নিকট সংস্পর্শ উপভোগ করেন। কলম্বাস হলে বক্তৃতা-মঞ্চের উপর যখন তাঁহারা বসিয়া থাকেন, তখন তো এই সুযোগ পাওয়া যায় না।

এই সাক্ষাৎকার-কক্ষে সমধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি হইলেন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। লম্বা মজবুত চেহারা, হিন্দুস্থানীদের বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী, মুখ কামান, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন সুসমঞ্জস, দাঁতগুলি সাদা, সুচারু ওষ্ঠদ্বয় কথোপকথনের সময় স্নিগ্ধ হাসিতে একটু ফাঁক হইয়া যায়। তাঁহার সুঠাম মাথায় পীতাভ বা লালরঙের পাগড়ি থাকে। তিনি কখনও উজ্জ্বল কমলালেবু বর্ণের, কখনও বা গাঢ় লাল আলখাল্লা পরেন। আলখাল্লাটি কোমরবন্ধ দিয়া বাঁধা এবং হাঁটুর নীচে পড়ে। বিবেকানন্দ চমৎকার ইংরাজী বলেন এবং আন্তরিকতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলে সানন্দে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেন।

তাঁর সহজ চালচলনের সহিত একটি ব্যক্তিগত গাম্ভীর্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন তিনি মহিলাদের সহিত কথা বলেন, তখন বোঝা যায়, ইনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁহার সম্প্রদায়ের নিয়ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, ‘আমি যাহা খুশী তাহা করিতে পারি, আমি স্বাধীন। কখনও আমি হিমালয় পর্বতে বাস করি, কখনও বা শহরের রাস্তায়। পরের বারের খাবার কোথায় জুটিবে, তাহা আমি জানি না। আমার কাছে কোন টাকা পয়সা থাকে না। চাঁদা তুলিয়া আমাকে এখানে পাঠান হইয়াছে।’ নিকটে দুই-একজন তাঁহার স্বদেশবাসী দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া বিবেকানন্দ বলিলেন, ‘এঁরা আমার ভার লইবেন।’ ইহা দ্বারা অনুমিত হয়, তাঁহার চিকাগোর খাইখরচ

অপরে দিতেছে। যে পোষাক তিনি পরিয়াছিলেন, উহা তাঁহার স্বাভাবিক সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, 'ইহা তো একটি উৎকৃষ্ট পোষাক। দেশে আমি সামান্য কাপড় ব্যবহার করি। জুতাও পরি না।' জাতিভেদে তিনি বিশ্বাসী কিনা প্রশ্ন করিলে বলিলেন ,'জাতি একটি সামাজিক প্রথা। ধর্মের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি সব জাতির লোকের সঙ্গে মেলামেশা করি।'

মিঃ বিবেকানন্দের চেহারা এবং চালচলন হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, তিনি অভিজাত বংশে জন্মিয়াছেন। বহু বৎসরের স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য এবং গৃহহীন পরিব্রজ্যা সত্ত্বেও তাঁহার জন্মগত আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহার পারিবারিক নাম কেউ জানে না। ধর্মজীবন বরণ করিয়া তিনি তাঁহার 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'স্বামী' কথাটি সন্ন্যাসীর প্রতি সম্মানসূচক প্রয়োগ। তাঁহার বয়স ত্রিশ হইতে খুব বেশী নয়। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন জীবনের পরিপূর্ণতা এবং পরজীবনের ধ্যানের জন্যই সৃষ্ট। তথাপি মনে অনিবার্য কৌতূহল জাগেঃ ইঁহার সংসার-বিমুখতার মূলে কি কারণ নিহিত ছিল?

সব কিছু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া সম্বন্ধে একটি মন্তব্য শুনিয়া বিবেকানন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'প্রত্যেক নারীর মধ্যে আমি যখন শুধু জগন্মাতাকেই দেখিতে পাই, তখন আমি বিবাহ করিব কেন? এইসব ত্যাগ করিয়াছি কেন? সাংসারিক বন্ধন এবং আসক্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য, যাহাতে আর পুনর্জন্ম না হয়। মৃত্যুকালে আমি দৈবী সত্তায় মিশিয়া যাইতে চাই, ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইতে চাই। আমি তখন বুদ্ধত্ব লাভ করিব।'

এই কথা দ্বারা বিবেকানন্দ বলিতে চান না যে, তিনি বৌদ্ধ। কোন নাম বা সম্প্রদায় তাঁহাকে চিহ্নিত করিতে পারে না। তিনি উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সার্থক পরিণতিস্বরূপ, বিশাল স্বপ্নময় আত্মত্যাগপ্রধান হিন্দু সংস্কৃতির সুযোগ্য সন্তান, তিনি একজন যথার্থ সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ।

বিবেকানন্দের কাছে তাঁহার গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তিকা বিলি করিবার জন্য থাকে। রামকৃষ্ণ ছিলেন একজন হিন্দু সাধক। তাঁহার উপদেশে লোকে এত আকৃষ্ট হইত যে, অনেকে তাঁহার মৃত্যুর পর সংসারত্যাগ করিয়াছেন। মজুমদারও৩ এই মহাপুরুষকে গুরুর ন্যায় দেখিতেন। তবে মজুমদারের আদর্শ, যেমন যীশুখ্রীষ্ট শিক্ষা দিতেন, সংসারে অনাসক্তভাবে থাকিয়া পৃথিবীতে দেবভাব-প্রতিষ্ঠা।

ধর্ম-মহাসভায় বিবেকানন্দের ভাষণ আমাদের উপরকার আকাশের ন্যায় উদার। সকল ধর্মের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই হইবে ভবিষ্যতের সর্বজনীন ধর্ম। সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতি আর শাস্তি ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে নয়, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য সৎকর্ম—ইহাও তাঁহার ভাষণের অন্যতম বক্তব্য। তাঁহার চমৎকার ভাবরাশি ও চেহারার জন্য তিনি ধর্ম-মহাসভায় অত্যন্ত সমাদৃত। মঞ্চের উপর দিয়া তাঁহাকে শুধু চলিয়া যাইতে দেখিলেও লোকে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে। হাজার হাজার মানুষের এই অভিবাদন তিনি বালকসুলভ সরলতার সহিত গ্রহণ করেন, তাহাতে আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র নাই। এই বিনীত তরুণ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর পক্ষে নিঃস্বতা ও আত্মবিলুপ্তি হইতে সহসা ঐশ্বর্য ও প্রখ্যাতিতে আবর্তন নিশ্চিতই একটি অভিনব অভিজ্ঞতা। যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, থিওজফিষ্টরা হিমালয়ে 'মহাত্মা'দের অবস্থান সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, ঐ-বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কিনা। বিবেকানন্দ শুধু বলিলেন, 'আমি তাঁহাদের কাহাকেও কখনও দেখি নাই।' ইহার তাৎপর্য এই যে, হিমালয়ে ঐরূপ মহাত্মা হয়তো আছেন, তবে হিমালয়ের সহিত যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও তাঁহার এখন 'মহাত্মা'দের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

৩. ধর্ম-মহাসভায়

দি ডিউবুক, আইওয়া 'টাইম্‌স্‌', ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

বিশ্বমেলা, ২৮ সেপ্টেম্বর (বিশেষ সংবাদ):

ধর্ম-মহাসভার অধিবেশনটিতে তীব্র বাগ্‌বিতণ্ডা দেখা দিয়াছিল। ভদ্রতার পাতলা আবরণ অবশ্য বজায় ছিল, কিন্তু উহার পিছনে বৈরভাব প্রকাশ পাইতেছিল। রেভারেণ্ড জোসেফ কুক হিন্দুদের কঠোর সমালোচনা করেন, হিন্দুরা তাঁহাকে তীব্রতরভাবে পাল্টা আক্রমণ করিলেন। রেভারেণ্ড কুক বলেন, বিশ্বসংসার অনাদি—এ-কথা বলা একপ্রকার অমার্জনীয় পাগলামি। প্রত্যুত্তরে এশিয়ার প্রতিনিধিগণ বলেন, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট জগতের অযৌক্তিকতা স্বতঃসিদ্ধ। ওহাইও নদীর তীর হইতে লম্বা-পাল্লার কামান দাগিয়া বিশপ জে. পি নিউম্যান গর্জন করিয়া ঘোষণা করিলেন, প্রাচ্য-দেশীয়েরা মিশনরীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা উক্তি দ্বারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজকে অপমানিত করিয়াছেন, আর প্রাচ্য প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের শান্ত ও গর্বিত হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, উহা শুধু বিশপের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।

৪. বৌদ্ধ দর্শন

সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে তিনজন সুপণ্ডিত বৌদ্ধ চমৎকার সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় ঈশ্বর, মানুষ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখ্য বিশ্বাস উপন্যস্ত করেন। (ইহার পরে ধর্মপালের ‘বুদ্ধের নিকট জগতের ঋণ’ সংজ্ঞক বক্তৃতাটির চুম্বক দেওয়া হইয়াছে। অন্য এক সূত্রে জানা যায়, ধর্মপাল ভাষণের আগে একটি সিংহলী স্বস্তিবাচন গাহিয়াছিলেন।) অতঃপর সাংবাদিক লিখিতেছেনঃ

ধর্মপালের বক্তৃতার উপসংহারভাগ এত সুন্দর হইয়াছিল যে, চিকাগোর শ্রোতৃমণ্ডলী পূর্বে ঐরূপ কখনও শুনেন নাই। বোধ করি ডিমসথেনীজও উহা ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।

৫. বদমেজাজী মন্তব্য

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভাগ্য কিন্তু এত ভাল ছিল না। গোড়াতেই তাঁহার মেজাজ ঠিক ছিল না, অথবা কিছুক্ষণের মধ্যেই বাহ্যতঃ তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তিনি

কমলালেবু রঙের আলখাল্লা পরিয়াছিলেন। মাথায় ছিল ফিকা হলুদ রঙের পাগড়ি। বক্তৃতা দিতে উঠিয়াই তিনি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিদের ভীষণ আক্রমণ করিলেন ও বলিলেন, 'আমরা যাঁহারা প্রাচ্য দেশ হইতে আসিয়াছি, এখানে বসিয়া দিনের পর দিন মাতব্বরী ভাষায় শুনিতেছি যে, আমাদিগের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা উচিত, কেননা খ্রীষ্টান জাতিসমূহ সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী। আমাদের চারিপাশে তাকাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে খ্রীষ্টান দেশসমূহের মধ্যে ইংলণ্ড ২৫ কোটি এশিয়াবাসীর ঘাড়ে পা দিয়া বিত্তবিভব লাভ করিয়াছে। ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া আমরা দেখি, খ্রীষ্টান ইওরোপের সমৃদ্ধি শুরু হয় স্পেনে। আর স্পেনের ঐশ্বর্যলাভ মেক্সিকো আক্রমণের পর হইতে। খ্রীষ্টানরা সম্পত্তিশালী হয় মানুষ-ভাইদের গলা কাটিয়া। এই মূল্যে হিন্দুরা বড়লোক হইতে চায় না।'

(বক্তারা এই ভাবে আক্রমণ করিয়া চলিলেন। প্রত্যেক পরবর্তী বক্তা পূর্বগামী বক্তা অপেক্ষা যেন বেশী উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন।)

'আউটলুক ', ৭ অক্টোবর , ১৮৯৩

... ভারতবর্ষের খ্রীষ্টান মিশনরীদের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলে বিবেকানন্দ তাঁহার ধর্মযাজকের উপযোগী উজ্জ্বল কমলালেবু রঙের পোষাকে জবাব দিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠেন। খ্রীষ্টীয় মিশনসমূহের কাজের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মকে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই; তবে তাঁহার এই উক্তিও সত্য যে, খ্রীষ্টান প্রচারকগণ হাজার হাজার বৎসরের বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং জাতিসংস্কারযুক্ত হিন্দুধর্মকে বুঝিবার কোন প্রয়াস দেখান নাই। বিবেকানন্দের মতে—মিশনরীরা ভারতে গিয়া শুধু দুইটি কাজ করেন, যথা—দেশবাসীর পবিত্রতম বিশ্বাসসমূহের নিন্দা এবং জনগণের নীতি ও ধর্মবোধকে শিথিল করিয়া দেওয়া।

'ক্রিটিক', ৭ অক্টোবর , ১৮৯৩

ধর্ম-মহাসভার প্রতিনিধিগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিলেন সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক—সিংহলের বৌদ্ধ ধর্মযাজক এইচ. ধর্মপাল এবং হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্মপালের একটি ধারাল উক্তিঃ 'যদি ধর্মসংক্রান্ত ব্যাখান ও মতবাদ তোমার সত্যানুসন্ধানের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে উহাদিগকে সরাইয়া রাখ। কোন পূর্ব ধারণার বশীভূত না হইয়া চিন্তা করিতে, ভালবাসার জন্যই মানুষকে ভালবাসিতে, নিজের বিশ্বাসসমূহ নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করিতে এবং পবিত্র জীবন যাপন করিতে শেখ, সত্যের সূর্যালোক নিশ্চয়ই তোমাকে দীপ্ত করিবে।'

যদিও এই অধিবেশনের (ধর্ম-মহাসভার অন্তিম অধিবেশন) সংক্ষিপ্ত ভাষণসমূহের অনেকগুলিই খুব চমৎকার হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় অপর কেহই মহাসভার মূল আদর্শ, উহার কার্যগত ত্রুটি এবং উহার উৎকৃষ্ট প্রভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষণটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর এই ভাষণের কি আশ্চর্য প্রভাব হইয়াছিল, তাহার শুধু ইঙ্গিত মাত্র আমি দিতে পারি। বিবেকানন্দ যেন দেবদত্ত বাগ্মিতার অধিকার লইয়া জন্মিয়াছেন। তাঁহার হলুদ ও কমলালেবু রঙের চিত্তাকর্ষী পোষাক এবং প্রতিভাদীপ্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ বাণী ও সুমিষ্ট সতেজ কণ্ঠস্বর অপেক্ষা কম আকর্ষণ বিস্তার করে নাই।

... স্বামীজীর ধর্ম-মহাসভার শেষ ভাষণটির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়া সাংবাদিক মন্তব্য করিতেছেনঃ

বৈদেশিক মিশন সম্বন্ধে যে-সকল মনোবৃত্তি ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রকাশ পাইয়াছিল, উহাই বোধ হয় এই সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ফল। বিদ্যা ও জ্ঞানে গরিষ্ঠ প্রাচ্য পণ্ডিতগণকে শিক্ষা দিবার জন্য খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত শিক্ষানবীশকে পাঠাইবার ধৃষ্টতা ইংরেজী-ভাষাভাষী শ্রোতৃবর্গের নিকট ইহার আগে এমন দৃঢ়ভাবে আর তুলিয়া ধরা হয় নাই। আমরা যদি হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই, তবে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতির ভাব লইয়া উহা বলিতে হইবে। চরিত্রে এই দুইটি গুণ আছে, এমন

সমালোচক খুব দুর্লভ। বৌদ্ধেরা যেমন আমাদের নিকট হইতে শিখিতে পারে, আমাদেরও যে বৌদ্ধদের নিকট হইতে অনেক শিখিবার আছে, ইহা আজ হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। সামঞ্জস্যের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ প্রভাব কার্যকর হয়।

লুসি মনরো

‘চিকাগো’, ৩ অক্টোবর, ১৮৯৩

‘নিউ ইর্য়ক ওয়ার্ল্ড’ পত্রিকা ১ অক্টোবর, (১৮৯৩) ধর্ম-মহাসভার প্রত্যেক প্রতিনিধিকে একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি দ্বারা ঐ মহতী সভার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিবার অনুরোধ করিলে স্বামীজী গীতা এবং ব্যাসের বচন হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় বলিয়াছিলেনঃ

‘মণিমালার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সূত্রের ন্যায় আমি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে আসিয়া উহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি।’

‘প্রত্যেক ধর্মেই পবিত্র, সাধুপ্রকৃতি, পূর্ণতাসম্পন্ন মানুষ দৃষ্ট হয়। অতএব সব মতই মানুষকে একই সত্যে লইয়া যায়, কারণ বিষ হইতে অমৃতের উৎপত্তি কি সম্ভবপর?’

৬. ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

‘ক্রিটিক’, ৭ অক্টোবর, ১৮৯৩

ধর্ম-মহাসভার একটি পরিণাম এই যে, উহা একটি বিশেষ সত্যের প্রতি আমাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল। ঐ সত্যটি হইল এইঃ প্রাচীন ধর্মমতসমূহের অন্তর্নিহিত দর্শনে বর্তমান মানুষের উপযোগী অনেক চমৎকার শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। একবার যখন ইহা আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলাম, তখন ঐ-সকল ধর্ম-ব্যাখ্যাতাগণের প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য বাড়িয়া চলিল এবং স্বভাবসুলভ অনুসন্ধিৎসা লইয়া আমরা তাঁহাদিগকে বুঝিতে তৎপর হইলাম। ধর্ম-মহাসভা শেষ হইলে উপযুক্ত সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়াছিল

সিউআমি বিবেকানন্দের বক্তৃতা এবং প্রসঙ্গগুলির মাধ্যমে। বিবেকানন্দ এখন এই শহরে (চিকাগো) রহিয়াছেন। তাঁহার এই দেশে আসিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল—তাঁহার স্বদেশবাসী হিন্দুগণের মধ্যে নূতন নূতন শ্রমশিল্প আরম্ভ করিতে আমেরিকানগণকে প্ররোচিত করা। কিন্তু বর্তমানে সাময়িকভাবে তিনি ঐ পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াছেন, কেননা তিনি দেখিতেছেন, আমেরিকান জাতি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বদান্য বলিয়া এই দেশে বহু লোক নানা উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য আসিতেছে। আমেরিকায় এবং ভারতে দরিদ্রদের আপেক্ষিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিবেকানন্দ জবাব দিলেন, আমেরিকায় যাহাদিগকে গরীব বলা হয়, তাহারা ভারতে গেলে রাজার হালে থাকিতে পারিবে। তিনি চিকাগোর নিকৃষ্ট পাড়া ঘুরিয়া দেখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তই পাকা হইয়াছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক মান দেখিয়া তিনি খুশী।

যদিও বিবেকানন্দ উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন, তথাপি সন্ন্যাসিসঙ্ঘে যোগদান করিবার জন্য তিনি কুলমর্যাদা ত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীকে স্বেচ্ছায় জাতির সব অভিমান বিসর্জন দিতে হয়। বিবেকানন্দের আকৃতিতে তাঁহার আভিজাত্য সুচিহ্নিত। তাঁহার মার্জিত রুচি, বাগ্মিতা এবং মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব আমাদিগকে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে নূতন ধারণা দিয়াছে। তাঁহার প্রতি লোকে স্বতই একটি আকর্ষণ অনুভব করে। তাঁহার মুখশ্রীতে এমন একটি কমনীয়তা, বুদ্ধিমত্তা ও জীবন্তভাব আছে যে, উহা তাঁহার গৈরিক পোষাক এবং গভীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সহিত মিলিয়া মানুষের মনকে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি অনুকূল করে। এই জন্য ইহা মোটেই আশ্চর্য নয় যে, অনেক সাহিত্য-সভা তাঁহাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিয়াছে এবং বহু গীর্জাতেও তিনি ধর্মালোচনা করিয়াছেন। ইহার ফলে বুদ্ধের জীবন এবং বিবেকানন্দের ধর্মমত আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কোন স্মারকলিপি ছাড়াই বক্তৃতা দেন, তথ্য এবং সিদ্ধান্ত এমন নিপুণভাবে ন্যস্ত করেন যে, তাঁহার আন্তরিকতায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তাঁহার বলিবার উদ্দীপনা মাঝে মাঝে এত বাড়িয়া যায় যে, শ্রোতারা মাতিয়া উঠে। বিবেকানন্দ একজন যোগ্যতম জেসুইট ধর্মযাজকের মতই পণ্ডিত ও সংস্কৃতিমান্। তাঁহার মনের গঠনেও জেসুইটদের খানিকটা ধাঁচ যেন আছে। তাঁহার কথোপকথনে ছোট ছোট ব্যঙ্গোক্তিগুলি ছুরির মত ধারাল হইলেও

এত সূক্ষ্ম যে, তাঁহার অনেক শ্রোতাই উহা ধরিতে পারে না। তথাপি তাঁহার সৌজন্যের কখনও অভাব হয় না। তিনি আমাদের রীতিনীতির এমন কোন সাক্ষাৎ সমালোচনা কখনও করেন না, যাহাতে উহা কটু শোনায়। বর্তমানে তিনি আমাদিগকে তাঁহার বৈদান্তিক ধর্ম ও দার্শনিকগণের বাণী সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন। বিবেকানন্দের মতে অজ্ঞান জনগণের জন্য মূর্তিপূজার প্রয়োজন রহিয়াছে; তবে তিনি আশা করেন, এমন সময় আসিবে যখন আমরা সাকার উপাসনা এবং পূজা অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিতে ভগবানের সত্তা অনুভব করিব, মানুষের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধি করিতে পারিব। বুদ্ধ দেহত্যগ করিবার আগে যেমন বলিয়াছিলেন, বিবেকানন্দও সেইরূপ বলেন–'তোমার নিজের মুক্তি তুমি নিজেই সম্পাদন কর। আমি তোমাকে কোন সাহায্য করিতে পারি না। কেহই পারে না। নিজেই নিজেকে সাহায্য কর।'

লুসি মনরো

৭. পুনর্জন্ম

'ইভানষ্টন ইনডেক্স', ৭ অক্টোবর, ১৮৯৩

গত সপ্তাহে কংগ্রীগেশনাল চার্চ-এ অনেকটা সম্প্রতি-সমাপ্ত ধর্ম-মহাসভার ন্যায় একটি বক্তৃতামালার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বক্তা ছিলেন দুইজনঃ সুইডেনের ডক্টর কার্ল ভন বারগেন এবং হিন্দু সন্ন্যাসী সিউআমি বিবেকানন্দ। ... সিউআমি বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্ম-মহাসভায় একজন ভারতীয় প্রতিনিধি। তিনি তাঁহার অপূর্ব কমলালেবু রঙের পোষাক, ওজস্বী ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ বাগ্মিতা এবং হিন্দুদর্শনের আশ্চর্য ব্যাখ্যার জন্য বহু লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার চিকাগোতে অবস্থান তাঁহার প্রতি অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও সাধুবাদের হেতু হইয়াছে। বক্তৃতাগুলি তিনটি সন্ধ্যায় আয়োজিত হইয়াছিল।

শনিবার এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যার আলোচ্য বিষয়গুলির তালিকা দিয়া সাংবাদিক বলিতেছেনঃ

বৃহস্পতিবার ৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় ডক্টর ভন বারগেনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'সুইডেনের রাজকন্যা'-বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'হালডাইন বীমিশ'। হিন্দু সন্ন্যাসী বলেন 'পুনর্জন্ম' সম্বন্ধে। শেষের বক্তৃতাটি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, কেননা এই বিষয়টির আলোচ্য মতসমূহ পৃথিবীর এই অঞ্চলে বিশেষ শোনা যায় না। 'আত্মার জন্মান্তর-গ্রহণ' তত্ত্বটি এই দেশে অপেক্ষাকৃত নূতন এবং খুব কম লোকেই উহা বুঝিতে পারে; কিন্তু প্রাচ্যে উহা সুপরিচিত এবং ওখানে উহা প্রায় সকল ধর্মের বনিয়াদ। যাঁহারা মতবাদরূপে ইহার ব্যবহার করেন না, তাঁহারাও ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলেন না। পুনর্জন্মতত্ত্বের মীমাংসার প্রধান বিষয় হইল—আমাদের অতীত বলিয়া কিছু আছে কিনা। বর্তমান জীবন আমাদের একটি আছে, তাহা আমরা জানি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও একটা স্থির অনুভব আমাদের থাকে। তথাপি অতীতকে স্বীকার না করিয়া বর্তমানের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, জড়ের কখনও বিনাশ নাই, অবিচ্ছিন্ন উহার অস্তিত্ব। সৃষ্টি শুধু আকৃতির পরিবর্তন মাত্র। আমরা শূন্য হইতে আসি নাই। কেহ কেহ সব কিছুর সাধারণ কারণরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন। তাঁহারা মনে করেন, এই স্বীকার দ্বারাই সৃষ্টির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা হইল। কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপারেই আমাদিগকে ঘটনাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে—কোথা হইতে এবং কিভাবে বস্তুর উৎপত্তি ঘটে। যে-সব যুক্তি দিয়া ভবিষ্যৎ অবস্থান প্রমাণ করা হয়, সেই যুক্তিগুলিই অতীত অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়াও অন্য কারণ স্বীকার করা প্রয়োজন। বংশগতির দ্বারা ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। কেহ কেহ বলেন, 'কই, আমরা পূর্বেকার জন্ম তো স্মরণ করিতে পারি না।' কিন্তু এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে, যেখানে পূর্বজন্মের স্পষ্ট স্মৃতি বিদ্যমান। এখানেই জন্মান্তরবাদের বীজ নিহিত। সেহেতু হিন্দুরা মূকপ্রাণীর প্রতি দয়ালু, সেইজন্যই অনেকে মনে করেন, হিন্দুরা নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মান্তরে বিশ্বাসী। ইঁহারা নিম্ন প্রাণীর প্রতি দয়াকে কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু মনে করিতে পারেন না। জনৈক প্রাচীন হিন্দু ঋষি ধর্মের সংজ্ঞা দিয়াছেনঃ যাহাই মানুষকে উন্নত করে, তাহার নাম ধর্ম। পশুত্বকে দূর করিতে হইবে, মানবত্বকে দেবত্বে লইয়া যাইতে হইবে। জন্মান্তরবাদ মানুষকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে না। মানুষের আত্মা অন্য উচ্চতর লোকে গিয়া মহত্তর জীবন লাভ করিতে পারে। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্থলে সেখানে

তাহার আটটি ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে। এইভাবে উচ্চতর ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া অবশেষে সে পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা—অমৃতত্ব লাভ করিবে। মহাজনদের লোকসমূহে তখন সে নির্বাণের গভীর আনন্দ উপলব্ধি করিতে থাকিবে।

৮. হিন্দুসভ্যতা

[যদিও ষ্টিয়াটর শহরে ৯ অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতায় প্রচুর লোক সমাগম হইয়াছিল। 'ষ্টিয়াটর ডেইলি ফ্রী প্রেস' (৯ অক্টোবর) শুধু নিম্নের নীরস বিবরণটুকু পরিবেশন করিয়াছেন।]

অপেরা হাউসে শনিবার রাত্রে এই খ্যাতিমান্ হিন্দুর বক্তৃতা খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তুলনামূলক ভাষাবিদ্যার সাহায্যে তিনি আর্যজাতিসমূহ এবং নূতন গোলার্ধে তাঁহাদের বংশধরদিগের মধ্যে বহুপূর্বে স্বীকৃত সম্বন্ধ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ত্রি-চতুর্থ জনগণ যাহা দ্বারা অত্যন্ত হীনভাবে নিপীড়িত, সেই জাতিভেদ-প্রথার তিনি মৃদু সমর্থন করিলেন, আর গর্বের সহিত ইহাও বলিলেন যে, যে-ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর ক্ষমতাদৃপ্ত জাতিসমূহের উত্থান এবং পতন দেখিয়াছে, সেই ভারতবর্ষই এখন বাঁচিয়া আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দেশবাসীর ন্যায় অতীতকে ভালবাসেন। তাঁহার জীবন নিজের জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাঁহার স্বদেশে ভিক্ষাবৃত্তি এবং পদব্রজে ভ্রমণকে খুব উৎসাহিত করা হয়, তবে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সে-কথা বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। ভারতীয় গৃহে রান্না হইবার পর প্রথম খাইতে দেওয়া হয় কোন অতিথিকে। তারপর গৃহপালিত পশু, চাকর-বাকর এবং গৃহস্বামীকে খাওয়াইয়া বাড়ীর মেয়েরা অন্ন গ্রহণ করেন। দশবৎসর বয়সে ছেলেরা গুরুগৃহে যায়। গুরু দশ হইতে বিশ বৎসর পর্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষাদান করেন। তারপর তাহারা বাড়ীতে ফিরিয়া পারিবারিক পেশা অবলম্বন করে, অথবা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়। সে ক্ষেত্রে তাহাদের জীবন অনবরত ভ্রমণ, ভগবৎ-সাধনা এবং ধর্মপ্রচারে কাটে। যে অশন-বসন লোকে স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে দেয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, তাহারা

টাকাকড়ি কখনও স্পর্শ করে না। বিবেকানন্দ এই শেষোক্ত শ্রেণীর। বৃদ্ধ বয়সে লোকে সংসার ত্যাগ করে এবং কিছুকাল শাস্ত্রপাঠ এবং তপস্যা করিয়া যদি আত্মশুদ্ধি অনুভব করে, তখন তাহারাও ধর্মপ্রচারে লাগিয়া যায়। বক্তা বলেন যে, মানসিক উন্নতির জন্য অবসর প্রয়োজন। এদেশের আদিবাসীদের—যাহাদিগকে কলাম্বাস বর্বর অবস্থায় দেখিয়াছিলেন—তাহাদিগকে সুশিক্ষা না দিবার জন্য তিনি আমেরিকান জাতির সমালোচনা করেন। এই বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুক্ত রাখিয়াছেন।

৯. একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা

‘উইসকনসিন ষ্টেট জার্নাল’ ২১ নভেম্বর, ১৮৯৩

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ম্যাডিসন শহরের কংগ্রীগেশনাল চার্চ-এ গতরাত্রে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উহা গভীর দার্শনিক চিন্তা এবং মনোজ্ঞ ধর্মভাবের ব্যঞ্জক। যদিও বক্তা একজন পৌত্তলিক, তবুও তাঁহার উপদেশাবলীর অনেকগুলি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা অনায়াসে অনুসরণ করিতে পারেন। তাঁহার ধর্মমত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মত উদার। সব ধর্মকেই তিনি মানেন। যেখানেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখান হইতেই তিনি উহা গ্রহণ করিতে উন্মুখ। তিনি ঘোষণা করিলেন, ভারতীয় ধর্মসমূহের গোঁড়ামি, কুসংস্কার এবং অলস ক্রিয়াকাণ্ডের কোন স্থান নাই।

১০. হিন্দুধর্ম

‘মিনিয়াপলিস্ ষ্টার’ ২৫ নভেম্বর ১৮৯৩

গতকল্য সন্ধ্যায় ফার্ষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ (মিনিয়াপলিস্ শহরে) স্বামী বিবে কানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখান দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম চিরন্তন সত্যসমূহের মূর্ত প্রকাশ; সেইজন্য উহা স্বকীয় যাবতীয় সূক্ষ্ম ভাবরাশি দ্বারা সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট করিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে অনেক চিন্তাশীল নরনারী ছিলেন, কেননা বক্তাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ‘পেরিপ্যাটেটিকস্’ নামক দার্শনিক সমিতি। নানা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক, বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ছাত্রেরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিবে কানন্দ একজন ব্রাহ্মণ ধর্মযাজক। তিনি তাঁহার দেশীয় পোষাকে আসিয়াছিলেন—মাথায় পাগড়ি, কোমরে লাল কটিবন্ধ দিয়া বাঁধা গৈরিক আলখাল্লা এবং অধোদেশেও লাল পরিচ্ছদ।

তিনি তাঁহার ধর্মের শিক্ষাগুলি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত ধীর এবং স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করিতেছিলেন, ত্বরিত বাগ্‌বিলাস অপেক্ষা শান্ত বাচনভঙ্গী দ্বারাই যেন তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার কথাগুলি খুব সাবধানে প্রযুক্ত। উহাদের অর্থও বেশ পরিষ্কার। হিন্দুধর্মের সরলতর সত্যগুলি তিনি তুলিয়া ধরিতেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তিনি কোন কটূক্তি না করিলেও এমনভাবে উহার প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, যাহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্মকেই পুরোভাগে রাখা হইতেছিল। হিন্দুধর্মের সর্বাবগাহী চিন্তা এবং মুখ্য ভাব হইল মানবাত্মার স্বাভাবিক দেবত্ব। আত্মা পূর্ণস্বরূপ, ধর্মের লক্ষ্য হইল মানুষের এই সহজাত পূর্ণতাকে বিকাশ করা। বর্তমান শুধু অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী সীমারেখা। মানুষের ভিতর ভাল এবং মন্দ দুই প্রবৃত্তিই রহিয়াছে। সৎ সংস্কার বলবান্ হইলে মানুষ ঊর্ধ্বতর গতি লাভ করে অসৎ সংস্কারের প্রাধান্যে সে নিম্নগামী হয়। এই দুইটি শক্তি অনবরত তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। ধর্ম মানুষকে উন্নত করে, আর অধর্ম ঘটায় তাহার অধঃপতন।

কানন্দ আগামীকল্য সকালে ফার্ষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ বক্তৃতা করিবেন।

‘ডে ময়েন নিউজ’, ২৮ নভেম্বর , ১৮৯৩

সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আগত মনীষী পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ গত রাত্রে সেণ্ট্রাল চার্চ-এ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। চিকাগোর বিশ্বমেলা উপলক্ষে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসভায় তিনি তাঁহার দেশের ও ধর্মের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড এইচ. ও. ব্রীডেন বক্তাকে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়া দেন। বক্তা উঠিয়া সমবেত সকলকে মাথা নীচু করিয়া অভিবাদনের পর তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করেন। বিষয় ছিল—হিন্দুধর্ম। তাঁহার বক্তৃতা একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার নিজের ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে তিনি যে-সব দার্শনিক ধারণা পোষণ করেন, তাহার কিছু কিছু পরিচয় ঐ বক্তৃতাতেই পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান হইতে গেলে সকল ধর্মের সহিত পরিচয় অত্যাবশ্যক। এক ধর্মে যাহা নাই, অপর ধর্ম হইতে তাহা লওয়া যায়। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। প্রকৃত খ্রীষ্টানের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়। বিবেকানন্দ বলেন, 'তোমরা যখন আমাদের দেশে কোন মিশনরীকে পাঠাও, তিনি 'হিন্দু খ্রীষ্টানে' পরিণত হন, পক্ষান্তরে আমি তোমাদের দেশে আসিয়া 'খ্রীষ্টান হিন্দু' হইয়াছি।' আমাকে এই দেশে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আমি এখানে লোককে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিব কিনা। এই প্রশ্ন আমি অপমানজনক বলিয়া মনে করি। আমি ধর্ম পরিবর্তনে বিশ্বাস করি না। আজ কোন ব্যক্তি পাপকার্যে রত আছে, তোমাদের ধারণা—কাল যদি সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে ধীরে ধীরে সে সাধুত্ব লাভ করিবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, এই পরিবর্তন কোথা হইতে আসে? ইহার ব্যাখ্যা কি? ঐ ব্যক্তির তো নূতন একটি আত্মা হয় নাই, কেননা পূর্বের আত্মা মরিলে তবে তো নূতন আত্মার আবির্ভাবের কথা। বলিতে পার, ভগবান্ তাহার ভিতর পরিবর্তন আনিয়াছেন। ভাল, কিন্তু ভগবান্ তো পূর্ণ, সর্বশক্তিমান্ এবং পবিত্রতার স্বরূপ। তাহা হইলে প্রসঙ্গোক্ত ব্যক্তির খ্রীষ্টান হইবার পর ভগবান্ পূর্বের সেই ভগবানই থাকেন, কেবল যে পরিমাণ সাধুতা তিনি ঐ ব্যক্তিকে দিয়াছিলেন, উহা তাঁহাতে ঘাটতি পড়িবে।

আমাদের দেশে দুটি শব্দ আছে যাহার অর্থ এদেশে সম্পূর্ণ আলাদা। শব্দ দুটি হইল 'ধর্ম' এবং 'সম্প্রদায়'। আমাদের ধারণায় ধর্ম হইল সেই সার্বজনীন সত্য, যাহা সকল ধর্মমতের মধ্যেই অনুস্যূত। আমরা পরমত-অসহিষ্ণুতা ছাড়া আর সব কিছুই সহ্য করি।

অপর শব্দটি—'সম্প্রদায়', তাহার অর্থ একটি সমমতসমর্থক সখ্যবদ্ধ ব্যক্তির দল, যাঁহারা নিজদিগকে ধার্মিকতার আবরণে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া বলিতে থাকেন, 'আমাদের মতই ঠিক, তোমরা ভুলপথে চলিতেছ।' ইঁহাদের প্রসঙ্গে আমার দুই ব্যাঙের গল্পটি মনে পড়িল।

কোন কুয়ায় একটি ব্যাঙের জন্ম হয়, বেচারা সারাজীবন ওখানেই কাটাইতে থাকে। একদিন সমুদ্রের এক ব্যাঙ ঐ কুয়ায় পড়িয়া যায়। দুইজনের গল্প শুরু হইল সমুদ্র লইয়া। কূপমণ্ডূক ঐ আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, 'সমুদ্র কত বড়?' সাদাসিধা কোন উত্তর না পাইয়া সে তখন কুয়ার এক কোণ হইতে আর এক কোণে লাফ দিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সাগর অত বড় কিনা।' আগন্তুক বলিল, 'তা তো বটেই।' তখন কুয়ার ব্যাঙ আরও একটু বেশী দূর লাফাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, তবে এত বড় কি?' সাগরের ব্যাঙ তখন উত্তর দিল 'হ্যাঁ', তখন কূপমণ্ডুক মনে মনে বলিল—'এই ব্যাঙটি নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। আমি ওকে আমার কুয়ায় স্থান দিব না।' সম্প্রদায়গুলিরও এই একই অবস্থা। তাহাদের নিজেদের মত যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে তাহারা দূর করিয়া দিতে এবং পদদলিত করিতে চায়।

১১. হিন্দু সন্ন্যাসী

'অ্যাপীল-অ্যাভাল্যাঞ্চ', ১৬ জানুআরী ১৮৯৪

স্বামী বিবে কানন্দ নামে যে হিন্দু সন্ন্যাসী আজ রাত্রে এখানকার (মেমফিস্ শহরের) বক্তৃতাগৃহে ভাষণ দিবেন, তিনি এদেশে অদ্যাবধি ধর্মসভায় বা বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত শ্রেষ্ঠ বক্তাদের অন্যতম। তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতা, অতীন্দ্রিয় বিষয়ে গভীর উপলব্ধি, তর্কপটুতা এবং উদার আন্তরিকতা বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনের বিশিষ্ট চিন্তানায়কদের প্রখর মনোযোগ এবং সহস্র সহস্র নরনারীর প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল।

তারপর হইতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্যে তিনি বক্তৃতা-সফর করিয়াছেন এবং লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে।

বিবে কানন্দ কথোপকথনে অতিশয় অমায়িক ভদ্রলোক। ভাষায় তিনি যে-সকল শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা ইংরেজী ভাষার রত্নবিশেষ। তাঁহার চালচলন অত্যন্ত সুসংস্কৃত পাশ্চাত্য শিষ্টাচার ও রীতিনীতির সমকক্ষ। মানুষ হিসাবে তাঁহার সাহচর্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী এবং কথাবার্তায় পাশ্চাত্য জগতের যে-কোন শহরের বৈঠকখানায় তিনি বোধ করি অপরাজেয়। তিনি শুধু প্রাঞ্জলভাবে নয় অনর্গলভাবেও ইংরেজী বলিয়া যান, আর তাঁহার অভিনব দীপ্তিমান্ ভাবরাশি আলঙ্কারিক ভাষায় চমকপ্রদ প্রবাহে যেন তাঁহার জিহ্বা হইতে নামিয়া আসে।

স্বামী বিবে কানন্দ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণজনোচিত শিক্ষাদীক্ষায় পালিত হন, কিন্তু পরে তিনি জাতি ও কুলমর্যাদা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মযাজক বা প্রাচ্যদেশের আদর্শে যাহাকে 'সন্ন্যাসী' বলা হয়, তাহাই হন। তিনি বরাবরই ঈশ্বর সম্বন্ধে মহত্তম ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই ধারণার অঙ্গীভূত রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির চৈতন্যাত্মকতায় বিশ্বাসী। বিবে কানন্দ বহু বৎসর ভারতবর্ষে উচ্চতর বিদ্যার সাধনায় এবং প্রচারে কাটাইয়াছেন। ইহার ফলে তিনি এমন প্রগাঢ় জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন যে, এই যুগের মহান্ চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের অন্যতম বলিয়া তাঁহার পৃথিবীময় খ্যাতি।

বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনে তাঁহার আশ্চর্য প্রথম বক্তৃতাটি তৎক্ষণাৎ সমবেত বিশিষ্ট ধর্মনায়কদের মধ্যে তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিল। সম্মেলনের অধিবেশনসমূহে তাঁহার ধর্মের সপক্ষে তিনি অনেকবার বলিয়াছেন। মানুষের ও তাহার স্রষ্টার প্রতি মানুষের উচ্চতর কর্তব্য-সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাঁহার মুখ হইতে এমন কতকগুলি কথা বাহির হইয়াছিল, যাহা ইংরেজী ভাষার অতি মূল্যবান্ মনোজ্ঞ দার্শনিক সম্পদ। চিন্তায় তিনি একজন শিল্পী, বিশ্বাসে অধ্যাত্মবাদী এবং বক্তৃতামঞ্চে সুনিপুণ নাট্যকার বিশেষ।

মেমফিস্ শহরে পৌঁছিবার পর হইতে তিনি মিঃ হু. এল. ব্রিঙ্কলীর অতিথিরূপে রহিয়াছেন। ওখানে দিবারাত্র তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে উৎসুক শহরের বহু ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি টেনেসী ক্লাবেরও একজন বেসরকারী অতিথি। শনিবার সন্ধ্যায় মিসেস এস. আর. শেফার্ড কর্তৃক তাঁহার জন্য একটি অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়। রবিবারে কর্ণেল আর বি. স্নোডেন তাঁহার অ্যানিসডেল-এর গৃহে এই মাননীয় অতিথিকে ভোজনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ওখানে বিবে কানন্দের সহিত সহকারী বিশপ টমাস এফ. গেলর, রেভারেণ্ড ডক্টর জর্জ প্যাটারসন এবং আরও অনেক ধর্মযাজকের সাক্ষাৎ হয়।

গতকল্য বিকালে র‍্যানডলফ বিল্ডিং-এ অবস্থিত নাইণ্টিন্থ্ সেঞ্চুরী ক্লাবের কার্যালয়ে ঐ ক্লাবের কেতাদুরস্ত সভ্যদের নিকট তিনি একটি বক্তৃতা দেন। আজ রাত্রে শহরের বক্তৃতাগৃহে তাঁহার ভাষণের বিষয়বস্তু হইবে–'হিন্দুধর্ম' ।

১২. পরমত-সহিষ্ণুতার জন্য অনুনয়

'মেমফিস্ কমার্শিয়াল', ১৭ জানুআরী, ১৮৯৪

বেশ কিছু-সংখ্যক শ্রোতা গতরাত্রে প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দের হিন্দুধর্ম-বিষয়ক ভাষণ শুনিবার জন্য শহরের বক্তৃতাগৃহে সমবেত হইয়াছিলেন।

বিচারপতি আর. জে. মর্গ্যান বক্তাকে পরিচিত করিয়া দিতে গিয়া একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যপূর্ণ ভাষণে মহান্ আর্যজাতির ক্রমপ্রসারের বিবরণ দেন। তিনি বলেন, ইওরোপীয়গণ এবং হিন্দুরা উভয়েই আর্যজাতির শাখা, অতএব যিনি আজ তাঁহাদের কাছে বক্তৃতা দিবেন, তাঁহার আমেরিকাবাসীর সহিত জাতিগত আত্মীয়তা রহিয়াছে।

প্রাচ্যদেশের এই খ্যাতিমান্ পণ্ডিতকে বক্তৃতাকালে ঘন ঘন করতালি দ্বারা অভিনন্দিত করা হয়। সকলেই আগাগোড়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনেন। বক্তার শারীরিক আকৃতি বড় সুন্দর, গায়ের রঙ ব্রোঞ্জবর্ণ, দেহের অঙ্গসৌষ্ঠবও চমৎকার। তাঁহার

পরিধানে ছিল কোমরে কালো কটিবন্ধ-বেষ্টিত পাটলবর্ণের আলখাল্লা, কালো পেণ্টালুন এবং মাথায় কমনীয় ভাবে জড়ান ভারতীয় রেশমের পীতবর্ণ পাগড়ি। বক্তার বলিবার ধরন খুব ভাল এবং তাঁহার ব্যবহৃত ইংরেজী ভাষা শব্দনির্বাচন, ব্যাকরণের শুদ্ধতা এবং বাক্যগঠনের দিক্ দিয়া উৎকৃষ্ট। তাঁহার উচ্চারণের ত্রুটি শুধু কখনও কখনও যৌগিক শব্দের যে অংশে জোর দিবার কথা নয়, সেখানে জোর দেওয়া। তবে সম্ভবতঃ মনোযোগী শ্রোতারা সব শব্দই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৌলিক চিন্তায় ভরা, তথ্যপূর্ণ এবং উদার জ্ঞানে অনুস্যূত বক্তৃতাটি শুনিয়া তাঁহাদের এই প্রখর মনোযোগ নিশ্চিতই সার্থক হইয়াছিল। এই ভাষণটিকে যথার্থই বিশ্বজনীন পরধর্ম-সহিষ্ণুতার সপক্ষে একটি 'অনুনয়' বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বক্তা ভারতীয় ধর্মসংক্রান্ত নানা মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, পরমত-সহিষ্ণুতা এবং প্রেমই হইল প্রধান প্রধান ধর্মের মুখ্য উদ্দীপনা। তাঁহার মতে ইহাই যে-কোন ধর্মবিশ্বাসের শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তাঁহার ভাষণে হিন্দুধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ অবতারণা ছিল না। ঐ ধর্মের কিংবদন্তী বা আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ চিত্র উপস্থাপিত না করিয়া তিনি উহার অন্তর্নিহিত ভাবধারার একটি বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশেষ মতবাদ ও ক্রিয়াকর্মের তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তবে এইগুলির অতি স্পষ্ট সরল ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছিলেন। বক্তা হিন্দুধর্মের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেন। জন্মান্তরবাদ—যাহা অনেক সময়ে অপব্যাখ্যাত হয়—এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি হইতেই উদ্ভূত। বক্তা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন, কিভাবে তাঁহার ধর্ম কালের বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করিয়া সর্বকালে বর্তমান মানবাত্মার সত্যকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন। সব মানুষই যেমন আত্মার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে বিশ্বাসী, ব্রাহ্মণ্যধর্ম তেমনি আত্মার অতীত অবস্থাও স্বীকার করেন। বিবে কানন্দ ইহাও স্পষ্ট ভাবে বলেন যে, খ্রীষ্টধর্মে যাহাকে 'আদিম পাপ' বলা হয়, হিন্দুধর্মে উহার কোন স্থান নাই। মানুষ যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে—এই বিশ্বাসের উপর হিন্দুধর্ম মানুষের সকল চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করে। বক্তার মতে উন্নতি এবং শুদ্ধি আশার উপর স্থাপিত হওয়া বিধেয়। মানুষের উন্নতির অর্থ তাহার স্বাভাবিক পূর্ণতায় ফিরিয়া যাওয়া। সাধুতা এবং প্রেমের অভ্যাস দ্বারাই এই

পূর্ণতার উপলব্ধি হয়। ভারতবাসী যুগ যুগ ধরিয়া এই গুণগুলি কিভাবে অভ্যাস করিয়াছে—যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ কিভাবে নিপীড়িত জনগণের আশ্রয়ভূমি হইয়াছে, বক্তা তাহা নির্ণয় করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, রোম সম্রাট্ টাইটাস যখন জেরুসালেম আক্রমণ করিয়া য়াহুদীদের মন্দির ধ্বংস করেন, তখন হিন্দুরা য়াহুদীদের সাদরে আশ্রয় দিয়াছিল।

বক্তা খুব প্রাঞ্জল বর্ণনা দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, হিন্দুরা ধর্মের বহিরঙ্গের উপর বেশী ঝোঁক দেন না। কখনও কখনও দেখা যায়, একই পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রত্যেকেই ঈশ্বরের যে প্রধানতম গুণ—প্রেম, উহারই মাধ্যমে উপাসনা করিয়া থাকেন। বক্তা বলেন যে, সকল ধর্মেই ভাল জিনিষ আছে; সাধুতার প্রতি মানুষের যে উদ্দীপনাবোধ, সব ধর্মই হইল তাহার অভিব্যক্তি, অতএব প্রত্যেক ধর্মই শ্রদ্ধার যোগ্য। এই বিষয়টির উদাহরণস্বরূপ তিনি বেদের (?) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। একটি ঝরনা হইতে জল আনিতে বিভিন্ন লোকে যেমন বিভিন্ন গঠনের পাত্র লইয়া যায়, ধর্মসমূহও সেইরূপ সত্যকে উপলব্ধির বিভিন্ন আধারস্বরূপ। পাত্রের আকার আলাদা হইলেও লোকে যেমন একই জল উহাতে ভরিয়া লয়, সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ধর্মের মাধ্যমে আমরা একই সত্য গ্রহণ করি। ঈশ্বর প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসের মর্মবোদ্ধা। যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকা হউক, যে কোন রীতিতেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা হউক, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন।

বক্তা বলেন, খ্রীষ্টানরা যে-ঈশ্বরের পূজা করেন, হিন্দুদেরও উপাস্য তিনিই। হিন্দুদের ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কার্যের নির্ণায়ক মাত্র। ঈশ্বরের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ঐক্যবদ্ধ না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মূর্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করা অবশ্যই কিছু দুর্বলতা, তবে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মনীতি এইরূপ স্থূলভাবে স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। এই একই কারণে হিন্দুরা ভগবানের দৈবী গুণসমূহ নানা দেবদেবীর স্থূল প্রতিমার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে চায়।

হিন্দুদের অবতারবাদ-প্রসঙ্গে বক্তা কৃষ্ণের কাহিনী বলেন। পুরুষসংসর্গ ব্যতীত তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। যীশুখ্রীষ্টের চরিতকথার সহিত তাঁহার জীবন বৃত্তান্তের অনেক সাদৃশ্য

আছে। বিবে কানন্দের মতে কৃষ্ণের শিক্ষা হইল, ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—এই তত্ত্ব। ঈশ্বরকে ভয় করা যদি ধর্মের আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উহার পরিণতি হইল ঈশ্বরকে ভালবাসা।

তাঁহার সমগ্র বক্তৃতাটি এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না, কিন্তু উহা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃপ্রেম উপলব্ধির জন্য একটি চমৎকার আবেদন এবং একটি রমণীয় ধর্মবিশ্বাসের ওজস্বী সমর্থন। বিবে কানন্দের ভাষণের উপসংহার বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, যখন তিনি বলিলেন যে, খ্রীষ্টকে স্বীকার করিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত, তবে সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ এবং বুদ্ধকেও প্রণিপাত করা চাই; আর যখন মানব-সভ্যতার বর্বরতার একটি পরিষ্কার ছবি আঁকিয়া তিনি বলিলেন, সভ্যতার এই-সকল গ্লানির জন্য যীশুখ্রীষ্টকে দায়ী করিতে তিনি রাজী নন।

১৩. ভারতীয় আচার-ব্যবহার

‘অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ’ , ২১ জানুআরী, ১৮৯৪

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ গতকল্য বিকালে লা স্যালেট একাডেমীতে (মেমফিস্ শহরে) একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন শ্রোতৃসংখ্যা খুব কম ছিল।

বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘ভারতীয় আচার ব্যবহার’। বিবে কানন্দের ধর্মবিষয়ক চিন্তাধারা এই শহরের এবং আমেরিকার অন্যান্য নগরীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিত্তে সহজেই সমাদর লাভ করিতেছে।

তাঁহার মতবাদ খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের গোঁড়া বিশ্বাসের পক্ষে মারাত্মক। খ্রীষ্টান আমেরিকা এ-যাবৎ পৌত্তলিক ভারতবর্ষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে আলোকিত করিবার প্রভূত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে, কানন্দের ধর্মের প্রাচ্য বিভব আমাদের পিতৃপিতামহের উপদিষ্ট প্রাচীন খ্রীষ্টধর্মের সৌন্দর্যকে ছাপাইয়া গিয়াছে এবং উহা

আমেরিকার অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মহলের অনেকের মনে একটি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইবে।

বর্তমানকাল হইল 'খেয়ালের' যুগ। মনে হইতেছে যে, কানন্দ একটি 'বহুকালের অনুভূত চাহিদা' মিটাইতে পারিতেছেন। তিনি বোধ করি, তাঁহার দেশের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং আশ্চর্য পরিমাণে ব্যক্তিগত আকর্ষণ-শক্তিরও অধিকারী। তাঁহার বাগ্মিতায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যায়। যদিও তাঁহার মতবাদ খুব উদার, তবুও গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মে প্রশংসা করিবার মত বস্তু সামান্যই তিনি দেখিতে পান। এ পর্যন্ত মেমফিস্ শহরে যত বক্তা বা ধর্মযাজক আসিয়াছেন, মনে হয় কানন্দ তাঁহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা বেশী সমাদর বিশেষভাবে লাভ করিয়াছেন।

এই হিন্দু সন্ন্যাসী এখানে যেরূপ সহৃদয় অভ্যর্থনা পাইতেছেন, ভারতে খ্রীষ্টান মিশনরীরা যদি সেরূপ পাইতেন, তাহা হইলে অ-খ্রীষ্টান দেশসমূহে খ্রীষ্টবাণী প্রচারের কাজ খুব সুগম হইত। বিবে কানন্দের গতকল্য বিকালের বক্তৃতা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ দিয়া চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বদেশের প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাস এবং রীতিনীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান এবং বিষয়সমূহের বর্ণনা খুব সুষ্ঠু ও সহজভাবে দিতে পারেন।

বক্তৃতার সময় মহিলা শ্রোতারা তাঁহাকে ঘন ঘন প্রশ্ন করিতেছিলেন। তিনিও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। কেবল জনৈক মহিলা যখন তাঁহাকে একটি অবান্তর ধর্মপ্রসঙ্গে টানিয়া আনিতে চাহিয়া একটি প্রশ্ন তুলিলেন, তখন কানন্দ আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া উহার উত্তর দিতে রাজী হন নাই। প্রশ্নকর্ত্রীকে বলিলেন, অন্য কোন সময়ে তিনি 'আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ' প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মত বিবৃত করিবেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, তাঁহার পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়সে; আর তাঁহার পিতার আঠার বৎসর বয়সে। বক্তা নিজে বিবাহ করেন নাই। সন্ন্যাসীর বিবাহ

করিতে বাধা নাই, কিন্তু বিবাহ করিলে তাঁহার স্ত্রীকেও সন্ন্যাসিনী হইতে হয়। সন্ন্যাসিনী স্ত্রীর ক্ষমতা, সুবিধা এবং সামাজিক সম্মান তাঁহার স্বামীরই মত।৫

একটি প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বলেন, ভারতে কোন কারণেই বিবাহ-বন্ধন ছেদের প্রচলন নাই, তবে বিবাহের ১৪ বৎসর পরেও সন্তান না হইলে স্ত্রীর অনুমতি লইয়া স্বামী আর একটি বিবাহ করিতে পারেন। স্ত্রী আপত্তি করিলে ইহা সম্ভব নয়। বক্তা ভারতের প্রাচীন মন্দির এবং সমাধিস্তম্ভসমূহের অতি চমৎকার বর্ণনা দেন। বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রাচীনকালের ভাস্কর এবং শিল্পীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বর্তমানকালের কারিগরদের অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল।

স্বামী বিবে কানন্দ আজ রাত্রে ওয়াই. এম. এইচ. হলে এই শহরে তাঁহার শেষ বক্তৃতা করিবেন। তিনি চিকাগোর 'স্লেটন লাইসিআম ব্যুরো'-র সহিত এই দেশে তিন বৎসরের জন্য বক্তৃতাদানের একটি চুক্তি করিয়াছেন। কাল তিনি চিকাগো রওনা হইবেন। ২৫ তারিখ রাত্রিতে ওখানে তাঁহার একটি বক্তৃতা দিবার কথা।

ডেট্রয়েট ট্রিবিউন, ১৫ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

গত সন্ধ্যায় বেশ কিছু সংখ্যক শ্রোতা ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দের দর্শন ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইউনিটি ক্লাবের উদ্যোগে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ এই বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। তিনি তাঁহার দেশীয় পোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার কমনীয় মুখমণ্ডল এবং বলিষ্ঠ দেহ তাঁহার চেহারায় একটি সম্ভ্রান্ত ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাগ্মিতায় তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রখর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ঘন ঘন করতালি পড়িতেছিল। বক্তার আলোচ্য বিষয় ছিল—'ভারতের আচার-ব্যবহার'। উহা তিনি উৎকৃষ্ট ইংরেজীতে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, তাঁহাদের দেশের 'ইণ্ডিয়া' এবং দেশবাসীর 'হিন্দু' নাম ঠিক নয়। উহা বিদেশীদের উদ্ভাবিত। তাঁহাদের দেশের প্রকৃত নাম 'ভারত' এবং অধিবাসীরা 'ব্রাহ্মণ'। প্রাচীনকালে তাঁহাদের কথ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত। প্রত্যেকটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত পরিষ্কার বোধগম্য অর্থ ছিল, কিন্তু এখন সে-

সব চলিয়া গিয়াছে। জুপিটার শব্দের সংস্কৃত অর্থ 'স্বর্গস্থ পিতা'। বর্তমানকালে উত্তর ভারতের সব ভাষাই মোটামুটি একপ্রকার; কিন্তু উত্তর ভারতের লোক দক্ষিণ ভারতে গেলে তথাকার লোকের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিবে না। ফাদার মাদার, সিষ্টার ব্রাদার প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দগুলি শুনিতে অনেকটা একই রকম। বক্তা বলেন, এই কারণে এবং অন্যান্য তথ্যের প্রমাণ হইতেও তাঁহার মনে হয়, আমরা সকলেই একটি সাধারণ সূত্র—আর্যজাতি হইতে উদ্ভূত। এই আদিম আর্যজাতির প্রায় সব শাখাই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সমাজে চারটি শ্রেণীবিভাগ ছিল—পুরোহিত, রাজা ও সৈনিক, বণিক ও শিল্পী এবং শ্রমিক ও ভৃত্য। প্রথম তিন শ্রেণীর বালকগণকে যথাক্রমে দশ, এগার এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য গুরুকুলে অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে পাঠান হইত এবং তাহাদিগকে ত্রিশ, পঁচিশ ও কুড়ি বৎসর পর্যন্ত সেখানে থাকিতে হইত। প্রাচীনকালে বালক ও বালিকা উভয়ের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখন বালকদেরই সুযোগ বেশী। অবশ্য দীর্ঘকালের এই ভুলটি শুধরাইবার চেষ্টা চলিতেছে। বৈদেশিক অধিকারের পূর্বে ভারতবর্ষের দর্শন এবং নীতি-নিয়মাদির অনেক অংশ প্রাচীনকালে নারীদের দ্বারা প্রণীত। হিন্দুসমাজে নারীর স্বকীয় অধিকার আছে। এই অধিকার তাঁহারা বজায় রাখেন। তাঁহাদের স্বপক্ষে আইনও রহিয়াছে।

গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ছাত্রেরা বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারিত। সংসারের দায়িত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই এবং উভয়েরই নিজস্ব অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে কন্যা অনেক সময় নিজের পতি নিজেই মনোনয়ন করিত; কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই পিতামাতাই ঐ ব্যবস্থা করিতেন। বর্তমানকালে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য অনবরত চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দুদের বিবাহ-অনুষ্ঠানটি বড় সুন্দর। বর এবং কন্যা পরস্পর পরস্পরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া ভগবান্ এবং সমবেত সকলকে সাক্ষী মানিয়া শপথ করে যে, একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে। বিবাহ না করা পর্যন্ত কেহ পুরোহিত হইতে পারে না। প্রকাশ্য ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিবার সময় পুরুষের সহিত তাহার পত্নীও যায়। হিন্দুরা

এই পাঁচটিকে কেন্দ্র করিয়া মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যথা–দেবতা পিতৃপুরুষ দরিদ্র, ইতর প্রাণী এবং ঋষি বা শাস্ত্র। হিন্দুগৃহস্থের বাড়ীতে যতক্ষণ সামান্য কিছুও থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অতিথিকে ফিরিয়া যাইতে হয় না। অতিথির পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন শেষ হইলে গৃহের শিশুরা খায়, তারপর তাহাদের পিতা এবং সর্বশেষে জননী। হিন্দুরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দরিদ্র জাতি; কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া কখনও কেহ ক্ষুধায় মারা যায় না। সভ্যতা এক বিরাট কীর্তি। তুলনাস্বরূপ বলা হয় যে, ইংলণ্ডে যদি প্রতি চারিশত ব্যক্তির মধ্যে একজন মদ্যপায়ী থাকে তো ভারতে ঐ অনুপাতে প্রতি দশ লক্ষে একজন। বক্তা মৃত ব্যক্তির শবদাহ-অনুষ্ঠানের একটি বর্ণনা দেন। কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্র ছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য প্রচার করা হয় না। পনর দিন উপবাসের পর মৃতের আত্মীয়েরা পূর্বপুরুষদের নামে দরিদ্রদিগকে অর্থাদি দান করেন অথবা জনহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। নৈতিক আদর্শের দিক্ দিয়া হিন্দুরা অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা প্রভূত উন্নততর।

১৪. হিন্দু দর্শন

ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস, ১৬ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

মানরা যখন জেরুজালেম ধ্বংস করে, তখন বহু সহস্র য়াহুদী ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করে। আরবগণ কর্তৃক স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বহু সহস্র পারসীকও ভারতে আশ্রয় পায়, কেহই নিপীড়িত হয় নাই। হিন্দুরা বিশ্বাস করে–সকল ধর্মই সত্য। তবে তাহাদের ধর্ম অপর ধর্মসমূহ অপেক্ষা প্রাচীনতর। ইংরেজ মিশনরীদের প্রথম দলটিকে ইংরেজ সরকার যখন জাহাজ হইতে ভারতে নামিতে বাধা দেন, তখন একজন হিন্দুই তাঁহাদের হইয়া দরবার করিয়া তাঁহাদিগকে নামিতে সাহায্য করেন। যাহা সব কিছু মানিয়া লয়, তাহাই তো ধর্মবিশ্বাস। বক্তা অন্ধের হস্তী দর্শনের সহিত ধর্মমতের তুলনা করেন। এক একজন অন্ধ হাতীর দেহের এক একটি অংশ স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিয়া হাতী কি রকম, তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিল। নিজের অভিজ্ঞতার দিক্ দিয়া প্রত্যেকের উক্তিই সত্য

হইলেও হাতীর সামগ্রিক বর্ণনা তো কোনটি হইতেই পাওয়া যায় নাই। হিন্দু দার্শনিকরা বলেন, 'সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।' সব মানুষ কোন এক সময় একই রীতিতে চিন্তা করিবে, ইহা যাঁহারা আশা করেন তাঁহারা অলস স্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে ধর্মের মৃত্যু ঘটিবে। প্রত্যেক ধর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে, আর প্রত্যেকটি দল দাবী করে যে, উহাই সত্য এবং অপরেরা ভ্রান্ত। বৌদ্ধধর্মে অপর মতাবলম্বীদের উপর নিপীড়ন অবিদিত। বৌদ্ধধর্মই প্রথম নানা দেশে প্রচারক পাঠায় এবং বলিতে পারে যে, লক্ষ লক্ষ লোককে এক বিন্দু রক্তপাত না করিয়া স্বমতে আনিয়াছে। নানা দোষ এবং কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুরা কখনও অন্যের উপর অত্যাচার করে নাই। বক্তা জানিতে চান, নানা খ্রীষ্টান দেশের সর্বত্র যে-সর্ব অসাম্য রহিয়াছে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা ঐগুলি অনুমোদন করেন কিভাবে?

১৫. অলৌকিক ঘটনা

ইভনিং নিউজ, ১৭ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

'আমি আমার ধর্মের প্রমাণস্বরূপ কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাইব—নিউজ-পত্রিকার এই অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়।'—এই কাগজের জনৈক প্রতিনিধি বিবে কানন্দকে ঐ-বিষয়ক সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি দেখাইলে তিনি উপরিউক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ আমি অলৌকিক ঘটনা লইয়া কাজ করি না, আর দ্বিতীয়তঃ আমি যে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত, উহা অলৌকিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অলৌকিক ঘটনা বলিয়া কিছু আমরা মানি না। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের এলাকার বাহিরে আশ্চর্য অনেক কিছু ঘটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু ঐগুলি কোন-না-কোন নিয়মের অধীন। আমাদের ধর্মের সহিত ঐগুলির কোন সম্পর্ক নাই। যে-সব আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ ভারতবর্ষে করা হয় বলিয়া বৈদেশিক সংবাদপত্রে ছাপা হয়, ঐগুলির অধিকাংশই হইল হাতের চাল বা সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবজনিত চোখের ভ্রম। যথার্থ জ্ঞানী পুরুষেরা কখনও ঐ-সব করেন না। তাঁহারা কখনও পয়সার জন্য হাটে বাজারে এই-সব তুকতাক দেখাইয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়ান

না। যাঁহারা যথার্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং শুধু বালসুলভ কৌতূহলাক্রান্ত নয়, তাঁহারা ঐ-সকল জ্ঞানী-পুরুষের দেখা পান এবং তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন।

১৬. মানুষের দেবত্ব

ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস, ১৮ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

হিন্দু দার্শনিক এবং পুরোহিত স্বামী বিবে কানন্দ গত রাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ ‘মানুষের দেবত্ব’ সম্বন্ধে বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা বা ধর্মব্যাখ্যান-মালার উপসংহার করিয়াছেন। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও প্রাচ্যদেশীয় এই ভ্রাতার (এই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করা তিনি পছন্দ করেন) বক্তৃতামঞ্চে আসিবার আধ ঘণ্টা পূর্বেই সমগ্র গীর্জাটি দরজা পর্যন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ে ভরিয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর ও বৃত্তির লোকই ছিলেন—আইনজীবী, বিচারক, খ্রীষ্ট্রীয় ধর্মযাজক, ব্যবসায়ী, একজন য়াহুদী ধর্মযাজক এবং মহিলাদের তো কথাই নাই। মহিলারা বার বার উপস্থিত হইয়া এবং প্রখর মনোযোগ সহকারে তাঁহার ভাষণ শুনিয়া এই শ্যামবর্ণ আগন্তুককে তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ অর্পণ করিবার সুস্পষ্ট প্রবণতা প্রমাণ করিয়াছেন। বক্তা ভদ্রলোকদিগের বসিবার ঘরে বসিয়া আলাপ আলোচনায় যেমন সকলকে আকর্ষণ করিতে পারেন, সাধারণ বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়াও সেইরূপ পারেন।

গতরাত্রের বক্তৃতা পূর্বেকারগুলি হইতে কম বর্ণনামূলক ছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ বিবে কানন্দ মানবীয় এবং ঐশ্বরিক ব্যাপার লইয়া তত্ত্ববিদ্যার একটি আস্তরণ বুনিয়া চলেন। তাঁহার কথাগুলি এত যুক্তিসঙ্গত যে, বিজ্ঞানকে তিনি সাধারণ বুদ্ধির মত সরল করিয়া তুলেন। ন্যায়গর্ভ ভাষণটি যেন প্রাচ্য গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত তাঁহার স্বদেশে হাতে-বোনা এবং অতি চমৎকার নানা রঙের একটি বস্ত্রের মতই সুন্দর, উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ী। শিল্পী যেমন তাঁহার চিত্রে নিপুণভাবে নানা রঙ ব্যবহার করেন, এই শ্যামবর্ণ ভদ্রলোকও তাঁহার ভাষণে সেইরূপ কাব্যময় উপমা প্রয়োগ করেন। যেখানে যেটি মানায়

ঠিক সেখানে সেইটি তিনি বসাইয়া যান। উহার প্রতিক্রিয়া কিছু অদ্ভুত ঠেকিলেও উহার একটি আশ্চর্য আকর্ষণ আছে। চলচ্চিত্রের মত পর পর দ্রুত তাঁহার যুক্তিপ্রতিষ্ঠ সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত হইতেছিল, আর এই কুশলী বক্তার শ্রমও মাঝে মাঝে শ্রোতৃবৃন্দের উৎসাহপূর্ণ করতালি দ্বারা সার্থকতা লাভ করিতেছিল।

বক্তৃতার পূর্বে ঘোষণা হয় যে, বক্তার নিকট অনেকগুলি প্রশ্ন আনা হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলির উত্তর তিনি ব্যক্তিগতভাবে আলাদা দেওয়াই ভাল মনে করেন। তবে তিনটি প্রশ্ন তিনি বাছিয়া রাখিয়াছেন, ঐগুলির প্রত্যুত্তর বক্তৃতামঞ্চ হইতেই দিবেন। প্রশ্নগুলি এইঃ

(১) ভারতের লোকেরা কি তাহাদের শিশু-সন্তানদের কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করে?

(২) জগন্নাথের রথের চাকার নীচে পড়িয়া কি তাহারা মৃত্যুবরণ করে?

(৩) মৃত স্বামীর সহিত কি তাহারা জীবিত বিধবাকেও জোর করিয়া দাহ করে?

বিদেশে একজন আমেরিকানকে নিউ ইয়র্ক শহরের রাস্তায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা দৌড়াদৌড়ি করে কিনা—এই বিষয়ে, অথবা আমেরিকা সম্বন্ধে ইওরোপে এখনও পর্যন্ত প্রচলিত এই ধরনের আজগুবি খবর সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহা হইলে তিনি যেভাবে ঐ-সব প্রশ্নের উত্তর দিবেন, বক্তা বিবে কানন্দ প্রথম প্রশ্নটির জবাব সেই ভাবেই দিলেন। অর্থাৎ প্রশ্নটি এতই আজগুবী যে, উহার কোন গুরুত্বপূর্ণ উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কোন কোন সরল কিন্তু অজ্ঞ লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হিন্দুরা শুধু স্ত্রী-শিশুই কেন কুমীরদের মুখে দেয়?—ইহার উত্তরে বিবে কানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, উহার কারণ বোধ করি এই যে, স্ত্রী-শিশুদের মাংস বেশী নরম আর ঐ আজব দেশের নদীতে যে-সব হিংস্র জলজন্তু থাকে, তাহারা ঐরূপ মাংস সহজে হজম করিতে পারে। জগন্নাথ-সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্বন্ধে বক্তা ঐ তীর্থস্থানের দীর্ঘকাল প্রচলিত রথযাত্রা ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে, খুব সম্ভবতঃ কখনও কোন কোন অত্যুৎসাহী ভক্ত রথসংলগ্ন দড়িটি ধরিতে এবং টানিতে গিয়া পা পিছলাইয়া চাকার নীচে পড়িয়া মারা গিয়া থাকিবে। এইরূপ কোন

আকস্মিক দুর্ঘটনার অতিরঞ্জিত বর্ণনা হইতে পরে নানা বিকৃত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ-সব শুনিয়া অন্য দেশের সহৃদয় লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন।

হিন্দুরা জীবিত বিধবাদের অগ্নিসাৎ করে—বিবে কানন্দ ইহা অস্বীকার করেন। তবে ইহা সত্য যে, কখনও কখনও কোন বিধবা নিজে স্বেচ্ছায় অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন। এরূপ যখন ঘটিয়াছে, তখন পুরোহিত এবং সাধুসন্তেরা তাঁহাদিগকে ঐ কার্য হইতে বিরত থাকিতে পীড়াপীড়ি করিয়াছেন; কেননা ইঁহারা সকলেই আত্মহত্যার বিরোধী।

সকলের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও যদি পতিব্রতা বিধবা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার জন্য জিদ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একটি 'অগ্নিপরীক্ষা' দিতে হইত। তিনি অগ্নিশিখায় প্রথমে হাত ঢুকাইয়া দিতেন। যদি হাত পুড়িয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর সহিত সহমরণের ইচ্ছায় আর বাধা দেওয়া হইত না। কিন্তু ভারতই তো একমাত্র দেশ নয়, যেখানে প্রেমিকা নারী প্রেমাস্পদের মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত অমৃতলোকে অনুগমন করিয়াছেন। এই ধরনের মৃত্যুবরণ প্রত্যেক দেশেই হইয়াছে। যে-কোন দেশে ইহা এক প্রকার অস্বাভাবিক ধর্মোন্মত্ততা। অন্যত্র যেরূপ, ভারতেও উহা ঐরূপই অস্বাভাবিক। বক্তা পুনরায় বলেন, 'না, ভারতবাসী নারীদের পুড়াইয়া মারে না। পাশ্চাত্যদেশের মত তাহারা কখনও ডাইনীদেরও দগ্ধ করে নাই।'

অতঃপর বক্তৃতার প্রকৃত বিষয়ে আসিয়া বিবে কানন্দ প্রথমে মানব-জীবনের শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করেন। শরীর বাহিরের খোসা মাত্র; মনও একটি ক্রিয়াশীল বস্তুবিশেষ, ইহার কাজ খুব ত্বরিত এবং রহস্যময়; একমাত্র আত্মাই সুস্পষ্ট ব্যক্তি-সত্তা। আত্মার অন্তরস্বরূপের জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ হয়। আমরা যাহাকে 'পরিত্রাণ' বলি হিন্দুরা উহাকে বলেন 'মুক্তি'। বেশ বলবান্ যুক্তিসহায়ে বক্তা প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেক আত্মাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। আত্মা যদি কোন কিছুর অধীন হইত, তাহা হইলে উহা কখনও অমরত্ব লাভ করিতে পারিত না। কোন ব্যক্তি কিভাবে আত্মার স্বাধীনতা ও অমরত্বের প্রত্যাক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারে, তাহার উদাহরণস্বরূপ বক্তা তাঁহার দেশের একটি উপকথা বর্ণনা করেন।

আসন্নপ্রসবা এক সিংহী একটি মেষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার সময় বাচ্চা প্রসব করিয়া ফেলে এবং পরে মারা যায়। সিংহশাবকটিকে তখন এক মেষী স্তন্য পান করাইয়া বাঁচায়। শাবকটি মেষের দলে বাড়িতে থাকে। নিজেকে সে মেষ বলিয়া মনে করিত এবং আচরণও ঠিক মেষের ন্যায়ই করিত। একদিন আর একটি সিংহ আসিয়া তাহাকে দেখিতে পায় এবং তাহাকে একটি জলাশয়ের নিকট লইয়া যায়। জলে সে নিজের প্রতিবিম্ব অপর সিংহের মত দেখিয়া বুঝিল—সে মেষ নয়, সিংহ। তখন সে সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল। আমাদের অনেকেরই দশা ঐ ভ্রান্ত সিংহ-মেষের ন্যায়।

নিজদিগকে 'পাপী' মনে করিয়া আমরা কোণে লুকাইয়া থাকি এবং যত প্রকারে সম্ভব হীন আচরণ করিয়া চলি। নিজেদের আত্মার পূর্ণতা ও দেবত্ব আমরা দেখিতে পাই না। নরনারীর যে 'আমি', উহাই আত্মা। আত্মা যদি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, তাহা হইলে অনন্ত পূর্ণ স্বরূপ হইতে ব্যষ্টিগত বিচ্ছিন্নতা আসিল কিরূপে?—হ্রদের জলে সূর্যের যেমন আলাদা আলাদা অসংখ্য প্রতিবিম্ব পড়ে, ঠিক সেই ভাবে। সূর্য এক, কিন্তু প্রতিবিম্ব-সূর্য বহু। মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এক, কিন্তু নানা দেহে প্রতিবিম্ব-আত্মা বহু। বিম্ব-স্বরূপ পরমাত্মার অব্যাহত স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করা যায়। আত্মার কোন লিঙ্গ নাই। স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ দেহেই। এই প্রসঙ্গে বক্তা সুইডনবর্গের দর্শন ও ধর্মের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেন। হিন্দু বিশ্বাসসমূহের সহিত এই আধুনিক সাধু মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সম্বন্ধ খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল সুইডনবর্গ যেন প্রাচীন এক হিন্দু ঋষির ইওরোপীয় উত্তরাধিকারী—যিনি এক সনাতন সত্যকে বর্তমান কালের পোষাক পরাইয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ফরাসী দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক (বালজাক?) তাঁহার 'পূর্ণ আত্মা'র উদ্দীপনাময় প্রসঙ্গের মধ্যে এই ধরনের চিন্তাধারাকে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন মনে করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই পরিপূর্ণতা বিদ্যমান। তাহার শারীরিক সত্তার অন্ধকার গুহাগুলির ভিতর উহা যেন শুইয়া আছে। যদি বল, ভগবান্ তাঁহার পূর্ণতার কিছু অংশ মানুষকে দেন বলিয়াই মানুষ সৎ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, পরম দেবতা ভগবানের পূর্ণতা হইতে পৃথিবীর মানুষকে প্রদত্ত ততটা অংশ বাদ গেল। বিজ্ঞানের

অব্যর্থ নিয়ম হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যষ্টি আত্মার মধ্যে পূর্ণতা নিহিত, আর এই পূর্ণতাকে লাভ করার নামই মুক্তি—ব্যক্তিগত অনন্ততার উপলব্ধি। প্রকৃতি, ঈশ্বর, ধর্ম—তিনই তখন এক।

সব ধর্মই ভাল। এক গ্লাস জলের মধ্যে যে বাতাসের বুদ্বুদটি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, উহা চেষ্টা করে বাহিরের অনন্ত বায়ুর সহিত যুক্ত হইতে। বাতাসের বুদ্বুদটি যদি তেল, ভিনিগার বা এইরূপ অন্যান্য বিভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট তরল পদার্থে আটক পড়ে, তাহা হইলে উহার মুক্তির চেষ্টা তরল পদার্থটির ঘনত্ব অনুযায়ী কম বেশী ব্যাহত হয়। জীবাত্মাও সেইরূপ বিভিন্ন দেহের মধ্য দিয়া উহার স্বকীয় অনন্ততা লাভের জন্য প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে। আচার-ব্যবহার, পারিপার্শ্বিক ও বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং জলবায়ুর প্রভাব—এই-সব দিক্ বিচার করিয়া কোন এক মানবগোষ্ঠীর পক্ষে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম হয়তো সর্বাপেক্ষা উপযোগী। অনুরূপ কারণে আর একটি ধর্ম অপর এক মানবগোষ্ঠীর পক্ষে প্রশস্ত। বক্তার সিদ্ধান্তগুলির চুম্বক বোধ করি এই যে, যাহা কিছু আছে, সবই উত্তম। কোন একটি জাতির ধর্মকে হঠাৎ পরিবর্তন করিতে যাওয়া যেন—আল্পস্ পর্বত হইতে প্রবহমানা একটি নদীকে দেখিয়া কেন উহা তাহার বর্তমান পথটি লইয়াছে, সেই বিষয়ে সমালোচনা করা। আর এক ব্যক্তি হয়তো অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, হিমালয় হইতে নিঃসৃতা একটি খরস্রোতা নদী হাজার হাজার বৎসর যে-পথে বহিয়া চলিয়াছে, ঐ পথ উহার পক্ষে স্বল্পতম এবং সুষ্ঠুতম পথ নয়।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ঈশ্বরকে আমাদের পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কোথাও উপবিষ্ট একজন ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করেন। কাজেই যে-স্বর্গে সোনার রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে নীচের মর্ত্যলোকের দিকে তাকাইয়া স্বর্গ-মর্ত্যের পার্থক্য বুঝা যায় না, এমন স্বর্গে তিনি স্বস্তিবোধ করিতে পারেন না। যাহাকে খ্রীষ্টানরা আচরণের 'স্বর্ণোজ্জ্বল নীতি'৬ বলিয়া থাকেন, উহার পরিবর্তে হিন্দুরা এই নীতিতে বিশ্বাস করেন যে, যাহা কিছু 'অহং'শূন্য তাহাই ভাল; এবং 'আমিত্ব'-মাত্রই খারাপ, আর এই বিশ্বাস দ্বারা যথাকালে মানুষ তাহার

আত্মার অনন্ত স্বরূপ ও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। বিবে কানন্দ বলেন, তথাকথিত ‘সোনার নীতি’টি কী ভয়ানক অমার্জিত! সর্বদাই ‘আমি, আমি’ ।

অন্যের নিকট হইতে তুমি নিজে যেরূপ আচরণ চাও, তুমিও তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ কর! ইহা এক ভীষণ বর্বরোচিত ক্রূর নীতি, কিন্তু বক্তা খ্রীষ্টধর্মের এই মতবাদের নিন্দা করিতে চান না, কেননা যাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট, তাহারা ইহার সহিত নিজদিগকে বেশ মানাইয়া লইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যে বিপুল জলধারাটি বহিয়া চলিয়াছে, উহাকে বহিতে দেওয়াই কর্তব্য। যিনি উহার গতিকে পরিবর্তিত করিতে চাইবেন, তিনি নির্বোধ। প্রকৃতিই প্রয়োজনমত সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন। বিবে কানন্দ বেশ জোর দিয়াই বলেন যে, প্রেততত্ত্ববাদী বা অদৃষ্টবাদী—ইঁহারা সকলেই ভাল এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণকে ধর্মান্তরিত করিবার তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা বেশ ভালই করিতেছেন। তিনি যে হিন্দু, ইহাও উত্তম। তাঁহার দেশে বিভিন্ন স্তরের মেধাবিশিষ্ট লোকের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মমত প্রচলিত আছে। সবটা মিলিয়া একটি ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি লক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম আমিত্বকে বড় করে না। ইহার আকাঙ্ক্ষাসমূহ কখনও মানুষের অহমিকাকে জড়াইয়া নয়, ইহা কখনও পুরস্কারের আশা বা শাস্তির ভয় তুলিয়া ধরে না। হিন্দুধর্ম বলে, ব্যক্তি-মানব তাহার ‘অহং’কে বর্জন করিয়া অনন্তত্ব লাভ করিতে পারে।

মানুষকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য প্রলোভিত করিবার রীতি—ভগবান্ স্বয়ং পৃথিবীর একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রকট হইয়া ইহা প্রবর্তন করিয়াছেন বলা হইয়া থাকে—বস্তুতঃ অতি নিষ্ঠুর এবং ভয়াবহরূপে দুর্নীতিজনক। ধর্মান্ধগণ খ্রীষ্টীয় মতবাদ যদি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহা তাহাদের নৈতিক স্বভাবের উপর একটি লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে আত্মার অনন্ততা উপলব্ধির সময় পিছাইয়া যায়।

ডেট্রয়েট ট্রিবিউন, ১৮ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবে কানন্দ বলেন যে, ভারতে ধর্ম বা সামাজিক নিয়মের বশে বিধবাদের কখনও জোর করিয়া জীবন্ত দাহ করা হয় নাই। এই ঘটনাগুলির সব ক্ষেত্রেই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। পূর্বে ভারতের একজন সম্রাট্ সতীদাহ প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ পরে উহা আবার প্রচলিত হয়। অবশেষে ইংরেজ সরকার উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। সকল ধর্মেই একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ধর্মোন্মাদ। ইহা খ্রীষ্টধর্মে যেমন, হিন্দুধর্মেও তেমনি। ভারতে এমন সব ধর্মোন্মাদ দেখা যায়, যাহারা তপশ্চরণের নামে দিনের পর দিন সর্বক্ষণ মাথার উপরে হাত তুলিয়া রাখে। দীর্ঘকাল ঐরূপ করিবার ফলে হাতটি ক্রমে অসাড় হইয়া যায় এবং আজীবন ঐ অবস্থায় থাকে। কেহ কেহ ব্রত গ্রহণ করে—একভাবে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার। ক্রমে ইহাদের শরীরের নীচের দিকে সম্পূর্ণ অবশ হইয়া যায় এবং উহারা আর হাঁটিতে পারে না।

সব ধর্মই সত্য। মানুষ নৈতিকতা অনুশীলন করে, কোন দৈবাদেশের জন্য নয়, উহা ভাল বলিয়াই করে। হিন্দুরা ধর্মান্তরিত-করণে বিশ্বাস করে না। বক্তা বলেন, উহা অপচেষ্টা। অধিকাংশ ধর্মের পিছনে কত ঐতিহ্য, শিক্ষাদীক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা রহিয়াছে। অতএব কোন এক ধর্মপ্রচারকের পক্ষে অন্য ধর্মাবলম্বী কাহারও ধর্মবিশ্বাসসমূহকে ভুল বলিয়া ঘোষণা করা কী নির্বুদ্ধিতা! ইহা যেন কোন এশিয়াবাসীর আমেরিকায় আসিয়া মিসিসিপি নদীর গতিপথ দেখিবার পর ঐ নদীকে ডাকিয়া বলা, 'তুমি সম্পূর্ণ ভুল পথে প্রবাহিত হইতেছ। তোমাকে উৎপত্তি-স্থানে ফিরিয়া নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করিতে হইবে।' আবার আমেরিকাবাসী কেহ যদি আল্পস্ পর্বতে গিয়া জার্মান সাগরে পড়িতেছে এমন কোন নদীকে বলে যে, তাহার গতিপথ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এবং ইহার একমাত্র প্রতিকার হইল নূতন নির্দেশ অনুসারে প্রবাহিত হওয়া—তাহা হইলে উহাও একই প্রকার নির্বুদ্ধিতা হইবে। বক্তা বলেন যে, খ্রীষ্টানরা যাহাকে 'সোনার নিয়ম' বলেন, উহা মাতা বসুন্ধরার মতই পুরাতন। নৈতিকতার যাবতীয় বিধানেরই উৎপত্তি এই নিয়মটির মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মানুষ তো স্বার্থপরতার একটি পুঁটলি বিশেষ।

বক্তা বলেন যে, পাপীরা নরকাগ্নিতে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিবে—এই মতবাদ সম্পূর্ণ অর্থহীন। দুঃখ রহিয়াছে, ইহা যখন জানা কথা, তখন পূর্ণ সুখ কি করিয়া সম্ভব? বক্তা কোন কোন তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তির প্রার্থনা করিবার রীতিকে বিদ্রূপ করেন। তিনি বলেন যে, হিন্দু চোখ বুজিয়া অন্তরাত্মার উপাসনা করে, কিন্তু কোন কোন খ্রীষ্টানকে প্রার্থনার সময় তিনি কোন একটি দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, যেন স্বর্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট ভগবানকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন! ধর্মের ব্যাপারে দুটি চরম হইল—ধর্মান্ধ এবং নাস্তিক। যে নাস্তিক, তাহার কিছু ভাল দিক্‌ আছে, কিন্তু ধর্মান্ধের বাঁচিয়া থাকা শুধু তাহার ক্ষুদ্র 'আমি'টার জন্যই। জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি বক্তাকে যীশুর হৃদয়ের একটি ছবি পাঠাইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে তিনি ধন্যবাদ দিতেছেন, তবে তাঁহার মতে, ইহা গোঁড়ামির অভিব্যক্তি। ধর্মান্ধকে কোন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। তাহারা একটি অভিনব বস্তুবিশেষ।

১৭. ভগবৎপ্রেম

ডেট্রয়েট ট্রিবিউন, ২১ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

গত রাত্রে বিবে কানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রথম ইউনিটেরিয়ান চার্চে খুব ভিড় হইয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলী আসিয়াছিলেন জেফারসন এভিনিউ এবং উডওয়ার্ড এভিনিউ-এর উত্তরাংশ হইতে। তাঁহাদের অধিকাংশই মহিলা। ইঁহারা বক্তৃতাটিতে খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, মনে হইল। ব্রাহ্মণ বক্তার অনেকগুলি মন্তব্য সোৎসাহে হর্ষধ্বনি দ্বারা এই মহিলারা সমর্থন করিতেছিলেন।

বক্তা যে-প্রেমের বিষয় আলোচনা করিলেন, উহা যৌন আকর্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবাবেগ নয়। ভারতে ভগবদ্ভক্ত ঈশ্বরের জন্য যে নিষ্কলুষ পবিত্র অনুরাগ বোধ করেন, উহা সেই ভালবাসা। বিবে কানন্দ তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে আলোচ্য বিষয়টি এই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ 'ভারতীয় তাহার ভগবানের জন্য যে প্রীতি অনুভব করে।' কিন্তু

বলিবার সময় তিনি এই ঘোষিত বিষয়ের সীমার মধ্যে থাকেন নাই। বরং বক্তৃতার বেশীর ভাগ ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আক্রমণ। ভারতীয়ের ধর্ম এবং ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা ছিল উহার গৌণ অংশ। বক্তৃতার অনেক বিষয় ভারতেতিহাসের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কতকগুলি প্রাসঙ্গিক কাহিনীর সাহায্যে বিশদীকৃত হয়। এই কাহিনীগুলির পাত্র ভারতবর্ষের বিখ্যাত মোগল সম্রাটগণ, হিন্দুরাজগণ নয়।

বক্তা ধর্মাচার্যগণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন—জ্ঞানমার্গের পথিক ও ভক্তিপথের অনুগামী। প্রথম শ্রেণীর জীবনের লক্ষ্য হইল প্রত্যক্ষ অনুভূতি, দ্বিতীয়ের ভগবৎপ্রেম। বক্তা বলেন, প্রেম হইল আত্মত্যাগ। প্রেম কিছু গ্রহণ করে না সর্বদাই দিয়া যায়। হিন্দু ভক্ত ভগবানের কাছে কোন কিছু চায় না, মুক্তি বা পারলৌকিক সুখের জন্য কখনও প্রার্থনা করে না। সে তাহার সকল চেতনা অনুরাগের গাঢ় উল্লাসে প্রেমাস্পদ ভগবানের প্রতি নিযুক্ত করে। ঐ সুন্দর অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর তখনই, যখন মানুষ ভগবানের জন্য গভীর অভাব বোধ করিতে থাকে। তখন ভগবান্ তাঁহার পরিপূর্ণ সত্তায় ভক্তের নিকট আবির্ভূত হন।

ঈশ্বরকে আমরা তিনভাবে ধারণা করিতে পারি। একটি হইল—তাঁহাকে এক বিরাট ক্ষমতাবান্ পুরুষ বলিয়া মনে করা এবং মাটিতে পড়িয়া তাঁহার মহিমার স্তুতি করা। দ্বিতীয়ঃ তাঁহাকে পিতৃদৃষ্টিতে ভক্তি করা। ভারতে পিতাই সব সময় সন্তানদের শাসন করেন। সেই জন্য পিতার উপর ভক্তিশ্রদ্ধায় খানিকটা ভয়ও মিশিয়া থাকে। আরও একটি ভাব হইল ভগবানকে 'মা' বলিয়া চিন্তা করা। ভারতে জননী সর্বদাই যথার্থ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই ঈশ্বরের প্রতি মাতৃভাব ভারতে খুব স্বাভাবিক।

কানন্দ বলেন যে, যথার্থ ভক্ত ভগবদনুরাগে এত বিভোর থাকেন যে অপর ধর্মাবলম্বীদের নিকট গিয়া তাহারা ভুল পথে ঈশ্বর সাধনা করিতেছে, ইহা বলিবার এবং তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিবার সময় তাঁহার নাই।

ডেট্রয়েট জার্নাল, ২১ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

'একটি শখ মাত্র।' –

আধুনিক কালের ধর্ম সম্বন্ধে ইহাই বিবে কানন্দের অভিমত! ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বিবে কানন্দ, যিনি এই ডেট্রয়েট শহরে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছেন, যদি আরও এক সপ্তাহ এখানে থাকিতে রাজী হন, তাহা হইলে শহরের বৃহত্তম হলঘরটিতেও তাঁহার আগ্রহশীল শ্রোতৃমণ্ডলীর স্থান কুলাইবে না। তিনি এখানে দস্তুরমত একটি আকর্ষণ হইয়া পড়িয়াছেন। গতকল্য সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান চার্চের প্রত্যেকটি আসন ভরিয়া যায়; বহু লোককে বাধ্য হইয়া বক্তৃতার সারা সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

বক্তার আলোচ্য বিষয় ছিল 'ভগবৎপ্রেম'। প্রেমের সংজ্ঞা তিনি দিলেন–'যাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, যাহাকে ভালবাসি তাহার স্তুতি ও ভজনা ব্যতীত যাহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।' বক্তা বলেন, প্রেম এমন একটি গুণ, যাহা বিনীতভাবে পূজা করিয়া যায় এবং প্রতিদানে কিছুই চায় না। ভগবৎপ্রেম জাগতিক ভালবাসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সাধারণতঃ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাড়া ভগবানকে আমরা চাই না। বক্তা নানা গল্প ও উদাহরণ দ্বারা দেখান, আমাদের ভগবদর্চনার পিছনে স্বার্থবুদ্ধি কিভাবে নিহিত থাকে। বক্তা বলেন, খ্রীষ্টীয় বাইবেলের সর্বাপেক্ষা চমৎকার অংশ হইল 'সলোমনের গীতি'; তবে তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে, এই অংশকে বাইবেল হইতে বাদ দিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বক্তা শেষের দিকে যেন এক প্রকার চূড়ান্ত যুক্তিস্বরূপ বলিলেন, 'ইহা হইতে কতটা লাভ আদায় করিতে পারি'–এই নীতির উপরই আমাদের ঈশ্বর-প্রেম স্থাপিত দেখা যাইতেছে। ভগবানকে ভালবাসিবার সহিত খ্রীষ্টানদের এত স্বার্থবুদ্ধি জড়িত থাকে যে, তাহারা সর্বদাই তাঁহার নিকট কিছু না কিছু চাহিয়া থাকে। নানাপ্রকারের ভোগ-সামগ্রীও তাহার অন্তর্ভুক্ত। অতএব বর্তমানকালের ধর্ম একটা শখ ও ফ্যাশন মাত্র, আর মানুষ ভেড়ার পালের মত গীর্জায় ভিড় করে।

১৮. ভারতীয় নারী

ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস, ২৫ মার্চ, ১৮৯৪

কানন্দ গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে-এ ‘ভারতীয় নারী’ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি প্রাচীন ভারতের নারীগণের প্রসঙ্গে বলেন যে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে তাঁহাদিগকে গভীর শ্রদ্ধা দেখান হইয়াছে। অনেক নারী ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা তখন ছিল খুবই প্রশংসনীয়। প্রাচ্যের নারীগণকে প্রতীচ্যের আদর্শে বিচার করা ঠিক নয়। পাশ্চাত্যে নারী হইলেন পত্নী, প্রাচ্যে তিনি জননী। হিন্দুরা মাতৃভাবের পূজারী। সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত গর্ভধারিণী জননীর সম্মুখে ভূমিতে কপাল ঠেকাইয়া সম্মান দেখাইতে হয়। ভারতে পবিত্রতার স্থান খুব উঁচুতে। কানন্দ এখানে যে-সব ভাষণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সকলে উহা খুব পছন্দ করিয়াছেন।

ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজ, ২৫ মার্চ, ১৮৯৪

গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে-এ স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার বিষয় ছিল—‘প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান যুগে ভারতীয় নারী’। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে নারীকে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়। নারীর সমগ্র জীবনে এই একটি চিন্তা তাঁহাকে তৎপর রাখে যে, তিনি মাতা; আদর্শ মাতা হইতে গেলে তাহাকে খুব পবিত্র থাকিতে হইবে। ভারতে কোন জননী কখনও তাহার সন্তানকে ত্যাগ করে নাই। বক্তা বলেন, ইহার বিপরীত প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিতেছেন। ভারতের মায়েরা যদি আমেরিকান তরুণীদের মত শরীরের অর্ধেক ভাগ যুবকদের কুদৃষ্টির সামনে খুলিয়া রাখিতে বাধ্য হইত, তাহা হইলে তাহারা মরিয়া যাইত। বক্তা ইচ্ছা করেন যে, ভারতকে তাহার নিজস্ব আদর্শে বিচার করা উচিত, এই দেশের আদর্শে নয়।

ট্রিবিউন, ১ এপ্রিল, ১৮৯৪

স্বামী বিবে কানন্দের ডেট্রয়েটে অবস্থান কালে নানা কথোপকথনে তিনি ভারতীয় নারীগণ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি যে-সব তথ্য উপস্থাপিত করেন, তাহাতে শ্রোতাদের কৌতূহল উদ্দীপিত হয় এবং ঐ বিষয়ে সর্বসাধারণের জন্য একটি বক্তৃতা দিবার অনুরোধ আসে। কিন্তু তিনি বক্তৃতার সময় কোন স্মারকলিপি না রাখায় ভারতীয় নারী সম্বন্ধে পূর্বে ব্যক্তিগত কথোপকথনের সময় যে-সব বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা ঐ বক্তৃতায় বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার বন্ধুবর্গ কিছুটা নিরাশ হন, কিন্তু তাঁহার মহিলা শ্রোতাদের মধ্যে জনৈক তাঁহার অপরাহ্নের কথোপকথনের কিছু প্রসঙ্গ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহা এখন হইতে সর্বপ্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হইতেছেঃ

আকাশচুম্বী হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে আর্যগণ আসিয়া বসবাস করেন। এখনও পর্যন্ত ভারতে তাঁহাদের বংশধর খাঁটি ব্রাহ্মণ-জাতি বিদ্যমান। পাশ্চাত্য লোকের পক্ষে স্বপ্নেও এই উন্নত মানবগোষ্ঠীর ধারণা করা অসম্ভব। চিন্তায় কাজে এবং আচরণে ইঁহারা অতিশয় শুচি। ইঁহারা এত সাধুপ্রকৃতির যে, একথলি সোনা যদি প্রকাশ্যে পড়িয়া থাকে তো তাঁহাদের কেহ উহা লইবেন না। কুড়ি বৎসর পরেও ঐ থলিটি একই জায়গায় পাওয়া যাইবে। এই ব্রাহ্মণদের শারীরিক গঠনও অতি চমৎকার। কানন্দের নিজের ভাষায়ঃ 'ক্ষেতে কর্মনিরতা ইঁহাদের একটি কন্যাকে দেখিলে মন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়, আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে হয়—ভগবান্ এমন অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতিমা কি করিয়া গড়িলেন!' এই ব্রাহ্মণদের অবয়ব-সংস্থান সুসম্বদ্ধ, চোখ ও চুল কৃষ্ণবর্ণ এবং গায়ের রঙ—আঙুল ছুঁচবিদ্ধ করিলে উহা হইতে একটি রক্তবিন্দু যদি এক গ্লাস দুধে পড়ে, তাহা হইলে যে রঙ সৃষ্ট হয়, সেই রঙের। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণদের ইহাই বর্ণনা।

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকারের আইন-কানুন সম্বন্ধে বক্তা বলেন, বিবাহের সময় স্ত্রী যে যৌতুক পান, উহা সম্পূর্ণ তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি; উহাতে স্বামীর কখনও মালিকানা থাকে না। স্বামীর সম্মতি বিনা আইনতঃ তিনি উহা বিক্রয় বা দান করিতে পারেন। সেইরূপ

অন্য সূত্রে, তথা স্বামীর নিকট হইতেও তিনি যে-সকল অর্থাদি পান, উহা তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, তাঁহার ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন।

স্ত্রীলোক বাহিরে নির্ভয়ে বেড়াইয়া থাকেন। চারি পাশের লোকদের উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। হিমালয়ে পর্দাপ্রথা নাই। ওখানে এমন অঞ্চল আছে যেখানে মিশনরীরা কখনও পৌঁছিতে পারেন না। এইসব গ্রাম খুবই দুর্গম। অনেক চড়াই করিয়া এবং পরিশ্রমে ঐ-সকল জায়গায় পৌঁছান যায়। এখানকার অধিবাসীরা কখনও মুসলমান-প্রভাবে আসে নাই। খ্রীষ্টধর্মও ইহাদের নিকট অজানা।

১৯. ভারতের প্রথম অধিবাসীরা

ভারতের অরণ্যে এখনও কিছু কিছু বনবাসী অসভ্য লোক দেখা যায়। তাহারা অত্যন্ত বর্বর, এমন কি নরমাংসভোজী। ইহারাই দেশের আদিম অধিবাসী এবং কখনও আর্য বা হিন্দু হয় নাই। আর্যগণ ভারতে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিলে এবং দেশের ভূভাগে ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহাদের মধ্যে ক্রমশঃ নানাপ্রকার বিকৃতি প্রবেশ করে। সূর্যতাপও ছিল প্রচণ্ড। খর রৌদ্রে অনেকের গায়ের রঙ ক্রমশঃ কালো হইয়া যায়। হিমালয়পর্বতবাসী শ্বেতকায় লোকের উজ্জ্বল বর্ণ সমতলভূমির হিন্দুদের তাম্রবর্ণে পরিবর্তিত হওয়া তো কেবলমাত্র পাঁচ পুরুষের ব্যাপার। কানন্দের একটি ভাই আছেন, তিনি খুব ফর্সা, আবার দ্বিতীয় আর একটি ভাই-এর রঙ কানন্দের চেয়ে ময়লা। তাঁহার পিতামাতা গৌরবর্ণ। মুসলমানদের অত্যাচার হইতে নারীদের রক্ষা করার জন্যই নিষ্ঠুর পর্দাপ্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। গৃহে আবদ্ধ থাকিবার দরুন হিন্দু রমণীদের গায়ের রঙ পুরুষদের অপেক্ষা পরিষ্কার। কানন্দের বয়স একত্রিশ বৎসর।

২০. আমেরিকান পুরুষদের প্রতি কটাক্ষ

কানন্দ চোখের কোণে ঈষৎ কৌতুক মিশাইয়া বলেন যে, আমেরিকান পুরুষদের দেখিয়া তিনি আমোদ অনুভব করেন। তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়ান যে, স্ত্রীজাতি তাঁহাদের পূজার পাত্র, কিন্তু তাঁহার মতে আমেরিকানরা পূজা করেন রূপ ও যৌবনকে। তাঁহাদিগকে কখনও তো বলিরেখা বা পক্ব কেশের সহিত প্রেমে পড়িতে দেখা যায় না! বক্তা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দৃঢ় ধারণা এই যে, এক সময়ে বৃদ্ধা নারীদের পোড়াইয়া মারিবার জন্য মার্কিন পুরুষদের পুরুষানুক্রমে পাওয়া একটি কৌশল ছিল। বর্তমান ইতিহাস ইহার নাম দিয়াছে—ডাইনী-দহন। পুরুষরাই ডাইনীদের অভিযুক্ত করিত, আর সাধারণতঃ অভিযুক্তার জরাই ছিল তাহার প্রাণদণ্ডের কারণ। অতএব দেখা যাইতেছে, জীবন্ত নারীকে দগ্ধ করা শুধু যে একটি হিন্দুরীতি, তাহা নয়। বক্তার মতে খ্রীষ্টীয় গীর্জার তরফ হইতে এক সময়ে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের অগ্নিদগ্ধ করা হইত, ইহা স্মরণ রাখিলে হিন্দু বিধবাদের সহমরণ-প্রথার কথা শুনিয়া পাশ্চাত্য সমালোচকদের আতঙ্ক কম হইবে।

২১. উভয় দাহের তুলনা

হিন্দু বিধবা যখন মৃত পতির সহিত স্বেচ্ছায় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতেন, তখন ভুরিভোজন এবং সঙ্গীতাদিসহ একটি উৎসবের পরিবেশ সৃষ্ট হইত। মহিলা নিজে তাঁহার সর্বাপেক্ষা দামী বস্ত্র পরিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, স্বামীর সহিত সহমরণে তাঁহার নিজের এবং পরিবারবর্গের স্বর্গলোকে গতি হইবে। আত্মবলিদাত্রীরূপে তাঁহাকে সকলে পূজা করিত এবং তাঁহার নাম পরিবারের বিবরণীতে গৌরবান্বিত হইয়া থাকিত।

সহমরণ-প্রথা আমাদের নিকট যত নৃশংসই মনে হউক, খ্রীষ্টীয় সমাজের ডাইনী-দহনের তুলনায় ইহার একটা উজ্জ্বল দিক্ রহিয়াছে। যে-স্ত্রীলোককে ডাইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইত, গোড়া হইতেই তাহাকে পাপী সাব্যস্ত করা হইত। তারপর একটি বদ্ধ কারাকক্ষে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া পাপ স্বীকারের জন্য চলিত নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং ঘৃণিত বিচার-প্রহসন। অবশেষে শাস্তিদাতাদের হর্ষধ্বনির মধ্যে বেচারীকে টানিয়া বধ্যস্থানে লইয়া যাওয়া হইত। বলপূর্বক অগ্নিদাহের যন্ত্রণার মধ্যে তাহার সান্ত্বনা থাকিত শুধু দর্শকবৃন্দের আশ্বাস যে, মৃত্যুর পর অনন্ত নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার আত্মার ভাগ্যে ভবিষ্যতের যে ভীষণতর কষ্ট লেখা আছে, বর্তমান কষ্ট শুধু তাহার সামান্য একটি নিদর্শন।

২২. জননীগণ আরাধ্যা

কানন্দ বলেন যে, হিন্দুরা মাতৃ-ভাবটির পূজা করিতে শিক্ষা পায়। মায়ের স্থান পত্নীর ঊর্ধ্বে। মা হলেন আরাধনার পাত্রী। হিন্দুদের মনে ঈশ্বরের পিতৃভাব অপেক্ষা মাতৃভাবটিই বেশী স্থান পায়।

ভারতে কোন জাতির স্ত্রীলোককেই অপরাধের জন্য কঠিন শারীরিক শাস্তি দেওয়ার বিধান নাই। হত্যা-অপরাধ করিলেও নারী প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়। বরং অপরাধিনীকে গাধার পিঠে লেজের দিকে মুখ করিয়া বসাইয়া রাস্তায় ঘুরান হয়। একজন ঢোল পিটাইয়া তাহার অপরাধ উচ্চৈঃস্বরে জানাইয়া যায়; পরে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার এই অবমাননাকেই যথেষ্ট শাস্তি এবং ভবিষ্যতে অপরাধের পুনরাবৃত্তির প্রতিষেধক বলিয়া মনে করা হয়। অপরাধিনী প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিলে নানা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে গিয়া অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ পায় এবং এইভাবে সে পুনরায় শুচি হইতে পারে। অথবা সে স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশপূর্বক যথার্থ নিষ্পাপ জীবন লাভ করিতে পারে।

মিঃ কানন্দকে প্রশ্ন করা হয় যে, এইভাবে অপরাধিনী নারী সন্ন্যাসী-আশ্রমে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলে এবং সমাজ-শাসন এড়াইয়া গেলে পবিত্র ঋষিদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে ভণ্ডামির স্থান দেওয়া হয় কিনা। কানন্দ উহা স্বীকার করিলেন, তবে ব্যাখ্যা করিয়া ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, জনসাধারণ ও সন্ন্যাসীর মধ্যে অপর কেহ অন্তর্বর্তী নাই। সন্ন্যাসী সকল জাতির গণ্ডী ভাঙিয়া দিয়াছেন। একজন ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের কোন হিন্দুকে হয়তো স্পর্শ করিবেন না, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহা হইলে অত্যন্ত অভিজাত ব্রাহ্মণও তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে সঙ্কুচিত হইবেন না।

গৃহস্থেরা সন্ন্যাসীর ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সাধুতা সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস আছে। সন্ন্যাসীর ভণ্ডামি ধরা পড়িলে তাহাকে সকলে মিথ্যাচারী বলিয়া মনে করে। তাহার জীবন তখন অধম ভিক্ষুকের জীবন মাত্র। কেহ তাহাকে আর শ্রদ্ধা করে না।

২৩. অন্যান্য চিন্তাধারা

নারী রাজা অপেক্ষাও অধিক সম্মান ও সুবিধা ভোগ করেন। যখন গ্রীক পণ্ডিতেরা হিন্দুজাতির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন, তখন সকল গৃহের দ্বারই তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু মুসলমানরা যখন তাহাদের তরবারি এবং ইংরেজগণ তাহাদের গুলিগোলা লইয়া দেখা দিল, তখন সব দরজাই বন্ধ করা হইল। এই ধরনের অতিথিকে কেহ স্বাগত জানায় নাই। কানন্দ যেমন মিষ্ট করিয়া বলেন, 'যখন বাঘ আসে, তখন আমরা আমাদের দরজা জানালা বন্ধ রাখি, যতক্ষণ না বাঘ চলিয়া যায়।'

কানন্দ বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা তাঁহাকে বহুতর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য উদ্দীপনা দিয়াছে, তবে আমাদের তথা জগতের নিয়তি আজিকার আইন-প্রণেতার উপর অপেক্ষা করিতেছে না, উহা অপেক্ষা করিতেছে নারীজাতির উপর। কানন্দের উক্তিঃ 'তোমাদের দেশের মুক্তি দেশের নারীগণের উপরই নির্ভর করে।'

২৪. ধর্মে দোকানদারি

[মিনিয়াপলিস্ শহরে ১৮৯৩ খ্রীঃ, ২৬ নভেম্বর প্রদত্ত বক্তৃতার ‘মিনিয়াপলিস্ জার্নাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ।]

চিকাগো ধর্ম-মহাসভার খ্যাতিমান্ ব্রাহ্মণ পুরোহিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম-ব্যাখ্যান হইতে কিছু শিখিতে উদ্গ্রীব শ্রোতৃমণ্ডলী গতকল্য সকালে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ ভিড় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই বিশিষ্ট প্রতিনিধিকে এই শহরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন ‘পেরিপ্যাটেটিক ক্লাব’। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ঐ প্রতিষ্ঠানে তাঁহার বক্তৃতা হয়। গতকল্যকার বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে এই সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

প্রারম্ভিক প্রার্থনার পর ধর্মযাজক ডক্টর এইচ. এম. সিমন্স্–‘বিশ্বাস, আশা এবং দান’ সম্বন্ধে সেণ্ট পলের উক্তি পাঠ করেন। সেণ্ট পল যে বলিয়াছেন, ‘ইহাদের ভিতর দানই হইল সর্বোত্তম’–ইহার সমর্থনে ডক্টর সিমন্স্ ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের একটি শিক্ষা, মোসলেম ধর্মমতের একটি বচন এবং হিন্দু সাহিত্য হইতে কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। এই উক্তির সহিত সেণ্ট পলের কথার সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রার্থনা সঙ্গীতের পর স্বামী বিবেকান্দিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। তিনি বক্তৃতামঞ্চের ধারে আসিয়া দাঁড়ান এবং গোড়াতেই একটি হিন্দু উপাখ্যান বলিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন। উৎকৃষ্ট ইংরেজীতে তিনি বলেনঃ

তোমাদিগকে আমি পাঁচটি অন্ধের একটি গল্প বলিব। ভারতের কোন গ্রামে একটি শোভাযাত্রা চলিতেছে। উহা দেখিবার জন্য অনেক লোকের ভিড় হইয়াছে। বহু আড়ম্বরে সুসজ্জিত একটি হাতী ছিল সকলের বিশেষ আকর্ষণ। সকলেই খুব খুশী। পাঁচজন অন্ধও দর্শকের সারির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা তো চোখে দেখিতে পায় না, তাই ঠিক করিল হাতীকে স্পর্শ করিয়া বুঝিয়া লইবে জানোয়ারটি কেমন। ঐ সুযোগ

তাহাদিগকে দেওয়া হইল। শোভাযাত্রা চলিয়া গেলে সকলের সহিত তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। তখন হাতীর সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু হইল।

একজন বলিল, 'হাতী হইতেছে ঠিক দেওয়ালের মত।' দ্বিতীয় বলিল, 'না, তা তো নয়, উহা হইল দড়ির মত।' তৃতীয় অন্ধ কহিল, 'দূর, তোমার ভুল হইয়াছে, আমি যে নিজে হাত দিয়া দেখিয়াছি, উহা ঠিক সাপের মত।' আলোচনায় উত্তেজনা বাড়িয়া চলিল, তখন চতুর্থ অন্ধ বলিল যে, হাতী হইল ঠিক যেন একটি বালিশ। ক্রুদ্ধ বাদপ্রতিবাদে অবশেষে পঞ্চম অন্ধ মারামারি শুরু করিল। তখন একজন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'বন্ধুগণ ব্যাপার কি?' ঝগড়ার কারণ বলা হইলে আগন্তুক কহিল, 'মহাশয়রা, আপনাদের সকলের কথাই ঠিক। মুশকিল এই যে, আপনারা হাতীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করিয়াছেন। হাতীর পাশ হইল দেওয়ালের মত। লেজকে তো দড়ি মনে হইবেই। উহার শুঁড় সাপের মত বলা চলে, আর যিনি পায়ের পাতা ছুঁইয়া দেখিয়াছেন, তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, হাতী বালিশের মত। এখন আপনারা ঝগড়া থামান। বিভিন্ন দিক্ দিয়া হাতীর সম্বন্ধে আপনারা সকলেই সত্য কথা বলিয়াছেন।'

বক্তা বলেনঃ ধর্মেও এই ধরনের মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্যের লোক মনে করে, তাহারাই একমাত্র ঈশ্বরের খাঁটি ধর্মের অধিকারী; আবার প্রাচ্যদেশের লোকেরও নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে অনুরূপ গোঁড়ামি বিদ্যমান। উভয়েরই ধারণা ভুল। বস্তুতঃ ঈশ্বর প্রত্যেক ধর্মেই রহিয়াছেন।

প্রতীচীর চিন্তাধারা সম্বন্ধে বক্তা অনেক স্পষ্ট সমালোচনা করেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টানদের মধ্যে 'দোকানদারী' ধর্মের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের প্রার্থনাঃ হে ঈশ্বর আমাকে ইহা দাও, উহা দাও; হে প্রভু তুমি আমার জন্য ইহা কর, উহা করা। হিন্দু ইহা বুঝিতে পারে না। তাহার বিবেচনায় ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া ভুল। কিছু না চাহিয়া ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির বরং উচিত দেওয়া। ঈশ্বরের নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা না করিয়া তাঁহাকে এবং মানুষকে যথাসাধ্য দান করা—ইহাতেই হিন্দুর অধিকতর বিশ্বাস। বক্তা বলেন, তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যে অনেকেই যখন সময় ভাল চলিতেছে, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে

বেশ সচেতন, কিন্তু দুর্দিন আসিলে তাঁহাকে আর মনে থাকে না। পক্ষান্তরে হিন্দু ঈশ্বরকে দেখেন ভালবাসার পাত্ররূপে। হিন্দুধর্মে ভগবানের পিতৃভাবের ন্যায় মাতৃত্বের স্বীকৃতি আছে, কারণ ভালবাসার সুষ্ঠুতর পরিণতি ঘটে মাতাপুত্রের সম্বন্ধের মাধ্যমে। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান সারা সপ্তাহ টাকা রোজগারের জন্য খাটিয়া চলে, ইহাতে সফল হইলে সে ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলে, 'হে প্রভু, তুমি যে এই টাকা দিয়াছ, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।' তারপর যাহা কিছু সে রোজগার করিয়াছে, সবটাই নিজের পকেটে ফেলে। হিন্দু কি করে? সে টাকা উপার্জন করিলে দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করিয়া ঈশ্বরের সেবা করে।

বক্তা এইভাবে প্রাচী এবং প্রতীচীর ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা করেন। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে বিবেকানন্দীর উক্তির নিষ্কর্ষঃ তোমরা পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা মনে কর ঈশ্বরকে কবলিত করিয়াছ। ইহার অর্থ কি? ভগবানকে যদি তোমরা পাইয়াই থাকিবে, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে এত অপরাধ-প্রবণতা কেন? দশজনের মধ্যে নয়জন এত কপট কেন? ভগবান্ যেখানে, সেখানে কপটাচার থাকিতে পারে না। ভগবানের উপাসনার জন্য তোমাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ রহিয়াছে, সপ্তাহে একদিন ওখানে কিছু সময় তোমরা কাটাইয়াও আস, কিন্তু কয়জন তোমরা বাস্তবিকই ভগবানকে পূজা করিতে যাও? পাশ্চাত্যে গীর্জায় যাওয়া একটা ফ্যাশন-বিশেষ এবং তোমাদের অনেকেরই গীর্জায় যাওয়ার পিছনে অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবাসী তোমাদের ভগবানের উপর বিশেষ অধিকারের কোন দাবী থাকিতে পারে কি?

এই সময় বক্তাকে স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দিত করা হয়। বক্তা বলিতে থাকেনঃ আমরা হিন্দুধর্মাবলম্বীরা প্রেমের জন্য ভগবানকে ডাকায় বিশ্বাস করি। তিনি আমাদিগকে কি দিলেন সেজন্য নয়, তিনি প্রেমস্বরূপ বলিয়াই তাঁহাকে ভালবাসি। কোন জাতি বা সমাজ বা ধর্ম যতক্ষণ প্রেমের জন্য ভগবানকে আরাধনা করিতে ব্যগ্র না হইতেছে, ততক্ষণ উহারা ঈশ্বরকে পাইবে না। প্রতীচ্যে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং বড় বড় আবিষ্ক্রিয়ায় খুব করিতকর্মা, প্রাচ্যে আমরা ক্রিয়াপটু ধর্মে। তোমাদের দক্ষতা বাণিজ্যে,

আমাদের ধর্মে। তোমরা যদি ভারতে গিয়া ক্ষেতে মজুরদের সহিত আলাপ কর, দেখিবে রাজনীতিতে তাহাদের কোন মতামত নাই। ঐ সম্বন্ধে তাহারা একেবারেই অজ্ঞ। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে কথা কও, দেখিবে উহাদের মধ্যে যে দীনতম, সেও একেশ্বরবাদ দ্বৈতবাদ প্রভৃতি ধর্মের সব মতের বিষয় জানে। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, 'তোমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কি রকম?' সে বলিবে, 'অতশত বুঝি না, আমি খাজনা দিই এই পর্যন্ত, আর কিছু জানি না।' আমি তোমাদের শ্রমিক এবং কৃষকদের সহিত কথা কহিয়া দেখিয়াছি, তাহারা রাজনীতিতে বেশ দুরস্ত। তাহারা হয় ডেমোক্রাট, নয় রিপাবলিকান এবং রৌপ্যমান বা স্বর্ণমান কোন্‌টি তাহারা পছন্দ করে, তাহাও বলিতে পারে। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহারা ভারতীয় কৃষকদের মতই বলিবে—'জানি না'। একটি নির্দিষ্ট গীর্জায় তাহারা যায়, কিন্তু ঐ গীর্জার মতবাদ কি, তাহা তাহাদের মাথায় ঢুকে না। গীর্জায় নিজেদের সংরক্ষিত আসনের জন্য তাহারা ভাড়া দেয়—এই পর্যন্তই তাহারা জানে।

ভারতবর্ষে যে নানা প্রকারের কুসংস্কার আছে, বক্তা তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি পাল্টা প্রশ্ন তুলেন, 'কোন্ জাতি কুসংস্কার হইতে মুক্ত?' উপসংহারে বক্তা বলেনঃ প্রত্যেক জাতি ভগবানকে তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ প্রত্যেক জাতিরই ঈশ্বরের উপর দাবী আাছে। সৎপ্রবৃত্তি মাত্রই ঈশ্বরের প্রকাশ। কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে মানুষকে শিখিতে হইবে 'ভগবানকে চাওয়া'। এই চাওয়াকে বক্তা, জলমগ্ন ব্যক্তি যে প্রাণপণ চেষ্টায় বাতাস চায়, তাহার সহিত তুলনা করেন। বাতাস তাহার চাই-ই, কারণ বাতাস ছাড়া সে বাঁচিতে পারিবে না। পাশ্চাত্যবাসী যখন এইভাবে ভগবানকে চাহিতে পারিবে, তখনই তাহারা ভারতে স্বাগত হইবে, কেননা প্রচারকেরা তখন আসিবেন যথার্থ ভগবদ্ভাব লইয়া, ভারত ঈশ্বরবিমুখ—এই ধারণা লইয়া নয়। তাঁহারা আসিবেন যথার্থ প্রেমের ভাব বহন করিয়া, কতকগুলি মতবাদের বোঝা লইয়া নয়।

২৫. মানুষের নিয়তি

[মেমফিস্ শহরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৭ জানুআরী প্রদত্ত ভাষণের চুম্বক। ১৮ জানুআরী ‘অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ’ পত্রিকায় প্রকাশিত।]

শ্রোতৃসমাগম মোটের উপর ভালই হইয়াছিল। শহরের সেরা সাহিত্যরসিক ও সঙ্গীতামোদীরা, তথা আইন এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তা কোন কোন আমেরিকান বাগ্মী হইতে একটি বিষয়ে স্বতন্ত্র। গণিতের অধ্যাপক যেমন ছাত্রদের কাছে বীজগণিতের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় ধাপে ধাপে বুঝাইয়া দেন, ইনিও তেমনি তাঁহার বিষয়বস্তু সুবিবেচনার সহিত ধীরে ধীরে উপস্থাপিত করেন। কানন্দ৭ নিজের ক্ষমতা এবং যাবতীয় প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়কে সফলভাবে সমর্থন করিবার সামর্থ্যের উপর পূর্ণবিশ্বাস রাখিয়া কথা বলেন। এমন কোন ভাবধারা তিনি জানেন না বা এমন কোন কিছু ঘোষণা করেন না, যাহাকে শেষ পর্যন্ত তিনি ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতে পারিবেন না। তাঁহার বক্তৃতার অনেক স্থলে ইঙ্গারসোলের৮ দর্শনের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। তিনি মৃত্যুর পরে নরকে শাস্তিভোগে বিশ্বাস করেন না। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা যেভাবে ঈশ্বরকে মানেন, সেইরূপ ঈশ্বরেও তাঁহার আস্থা নাই। মানুষের মনকে তিনি অমর বলেন না, কারণ উহা পরতন্ত্র। সকল প্রকার আবেষ্টন হইতে যাহা মুক্ত নয়, তাহা কখনও অমর হইতে পারে না।

কানন্দ বলেনঃ ভগবান্ একজন রাজা নন, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন এক কোণে বসিয়া মর্ত্যবাসী মানুষের কর্ম অনুযায়ী দণ্ড বা পুরস্কার বিধান করিতেছেন। এমন এক সময় আসিবে, যখন মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিবে এবং বলিবে—আমি ঈশ্বর, আমি তাঁর প্রাণের প্রাণ। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, নিজেদের মৃত্যুহীন সত্তাই যখন ভগবান্, তখন তিনি অতি দূরে, এই শিক্ষা দিবার সার্থকতা কি?

তোমাদের ধর্মে যে আদিম পাপের কথা আছে উহা শুনিয়া বিভ্রান্ত হইও না, কেননা তোমাদের ধর্ম আদিম নিষ্পাপ অবস্থার কথাও বলে। আদমের যখন অধঃপতন ঘটিল, তখন উহা তো তাঁহার পূর্বেকার নির্মল স্বভাব হইতেই। (শ্রোতৃবৃন্দের হর্ষধ্বনি) পবিত্রতাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, আর সকল ধর্মাচরণের লক্ষ্য হইল উহা ফিরিয়া পাওয়া। প্রত্যেক মানুষ শুদ্ধস্বরূপ, প্রত্যেক মানুষ সৎ। আপত্তি উঠিতে পারে, কোন কোন মানুষ পশুতুল্য কেন? উত্তরে বলি, যাহাকে তুমি পশুতুল্য বলিতেছ, সে ধূলামাটিমাখা হীরকখণ্ডের মত। ধূলা ঝাড়িয়া ফেল, যে হীরা সেই হীরা দেখিতে পাইবে—যেন কখনও ধূলিলিপ্ত হয় নাই, এমন স্বচ্ছ। আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রত্যেক আত্মা একটি বৃহৎ হীরকখণ্ড।

আমাদের মানুষ-ভ্রাতাকে পাপী বলার চেয়ে নীচতা আর নাই। একবার একটি সিংহী একটি ভেড়ার পালে পড়িয়া একটি মেষকে নিহত করে। সিংহীটি ছিল আসন্নপ্রসবা। লাফ দিবার ফলে তাহার শাবকটি ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু লম্ফন-জনিত ক্লান্তিতে সিংহী মারা গেল। সিংহশিশুকে দেখিয়া একটি মেষমাতা উহাকে স্তন্য পান করাইতে থাকে। সিংহশাবক মেষের দলে ঘাস খাইয়া বাড়িতে লাগিল। একদিন একটি বৃদ্ধ সিংহ ঐ সিংহ-মেষকে দেখিতে পাইয়া ভেড়ার দল হইতে উহাকে সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সিংহ-মেষ ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বৃদ্ধ সিংহ অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং পরে উহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন সে উহাকে একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের ধারে লইয়া গিয়া বলিল, 'তুমি ভেড়া নও, সিংহ—এই জলের মধ্যে নিজের আকৃতি দেখ।' সিংহ-মেষও জলে প্রতিবিম্বিত নিজের চেহারা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি সিংহ, ভেড়া নই।' আসুন, আমরা নিজেদের মেষ না ভাবিয়া সিংহ ভাবি। আসুন, আমরা মেষের মত 'ব্যা ব্যা' করা এবং ঘাস খাওয়া পরিত্যাগ করি।

আমেরিকায় আমার চার মাস কাটিল। ম্যাসাচুসেটস্ রাজ্যে আমি একটি চরিত্র-সংশোধক জেল দেখিতে গিয়াছিলাম। জেলের অধ্যক্ষকে জানিতে দেওয়া হয় না—কোন্ কয়েদীর কি অপরাধ। কয়েদীদের প্রত্যেকের উপর যেন সহৃদয়তার একটি আচ্ছাদনী ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর একটি শহরের কথা জানি, যেখানে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা

সম্পাদিত তিনটি সংবাদপত্রে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, অপরাধীদের কঠিন সাজা হওয়া প্রয়োজন। আবার ওখানকার অন্য একটি কাগজের মতে দণ্ড অপেক্ষা ক্ষমাই সুসঙ্গত। একটি কাগজের সম্পাদক পরিসংখ্যান দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, যে-সব কয়েদীকে কঠোর সাজা দেওয়া হয়, তাহাদিগের শতকরা মাত্র পঞ্চাশ জন সৎপথে ফিরিয়া আসে; পক্ষান্তরে যাহারা মৃদুভাবে দণ্ডিত, তাহাদের ভিতর শতকরা নব্বই জন কারামুক্তির পর সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে।

ধর্মের উৎপত্তি মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতার ফলে নয়। কোন এক অত্যাচারীকে আমরা ভয় করি বলিয়া যে ধর্মের জন্ম, তাহাও নয়। ধর্ম হইল প্রেম—যে-প্রেম বিকশিত হইয়া, বিস্তারিত হইয়া, পুষ্টিলাভ করিয়া চলে। একটি ঘড়ির কথা ধর। ছোট একটি আধারের মধ্যে কল-কব্জা রহিয়াছে, আর রহিয়াছে একটি স্প্রিং। দম দেওয়া হইলে স্প্রিংটি উহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চায়। মানুষ হইল ঘড়ির স্প্রিং-এর মত। সব ঘড়ির যে একই রকমের স্প্রিং থাকিবে তাহা নয়, সেইরূপ সকল মানুষের ধর্মমত এক হইবার প্রয়োজন নাই। আর আমরা ঝগড়াই বা করিব কেন? আমাদের সকলের চিন্তাধারা যদি একই প্রকারের হইত, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যু ঘটিত। বাহিরের গতির নাম কর্ম, ভিতরের গতি হইল মানুষের চিন্তা। ঢিলটি মাটিতে পড়িল; আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উহার কারণ। ঘোড়া গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু ঘোড়াকে চালাইতেছেন ঈশ্বর। ইহাই গতির নিয়ম। ঘূর্ণিপাক জলস্রোতের প্রবলতা নির্ণয় করে। স্রোত যদি বন্ধ হয়, তাহা হইলে নদীও মরিয়া যায়। গতিই জীবন। আমাদের একত্ব এবং বৈচিত্র্য দুই-ই চাই। গোলাপকে অন্য এক নামেও ডাকিলেও উহার মিষ্ট গন্ধ আগেকার মতই থাকিবে। অতএব তোমার ধর্ম যাহাই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

একটি গ্রামে ছয়জন অন্ধ বাস করিত। তাহারা হাতী দেখিতে গিয়াছে। চোখে তো দেখিতে পায় না, হাত দিয়া অনুভব করিল হাতী কি রকম। একজন হাতীর লেজে হাত দিয়া দেখিল, একজন হাতীর পার্শ্বদেশে। একজন শুঁড়ে এবং চতুর্থ জন কানে। তখন তাহারা হাতীর বর্ণনা শুরু করিল। প্রথম অন্ধ বলিল, হাতী হইল দড়ির মত। দ্বিতীয় জন বলিল,

না, হাতী হইতেছে বিরাট দেওয়ালের মত। তৃতীয় অন্ধের মতে হাতী একটি অজগর সাপের মত; আর চতুর্থ জন—যে হাতীর কানে হাত দিয়াছিল—বলিল, হাতী একটি কুলার মত। মতভেদের জন্য অবশেষে তাহারা ঝগড়া এবং ঘুষাঘুষি আরম্ভ করিল। এমন সময়ে ঘটনাস্থলে একব্যক্তি আসিয়া পড়িল এবং তাহাদিগকে কলহের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অন্ধেরা বলিল যে, তাহারা হাতীটিকে দেখিয়াছে, কিন্তু হাতী সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই মত আলাদা এবং প্রত্যেকেই অপরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। তখন আগন্তুক তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের কাহারও কথা পুরা সত্য নয়, তোমরা অন্ধ। হাতী বাস্তবিক কি রকম, তাহা তোমরা কেহই জান না।'

আমাদের ধর্মের ব্যাপারেও এইরূপ ঘটিতেছে। আমাদের ধর্মের জ্ঞান অন্ধের হস্তীদর্শনের তুল্য। (শ্রোতৃমণ্ডলীর হর্ষধ্বনি)

ভারতে জনৈক সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, মরুভুমির বালি পিষিয়া কেহ যদি তেল বাহির করিতে পারে অথবা কুমীরের কামড় না খাইয়া তাহার দাঁত কেহ উপড়াইয়া আনিতে পারে—এ কথা বরং বিশ্বাস করিব, কিন্তু ধর্মান্ধ ব্যক্তির গোঁড়ামির পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি জিজ্ঞাসা কর ধর্মে ধর্মে এত পার্থক্য কেন, তো তাহার উত্তর এই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী হাজার মাইল পর্বতগাত্র বাহিয়া অবশেষে বিশাল সমুদ্রে গিয়া পড়ে। সেইরূপ নানা ধর্মও তাহাদের অনুগামিগণকে শেষ পর্যন্ত ভগবানের কাছেই লইয়া যায়। ১৯০০ বৎসর ধরিয়া তোমরা য়াহুদীগণকে দলিত করিবার চেষ্টা করিতেছ। চেষ্টা সফল হইয়াছে কি? প্রতিধ্বনি উত্তর দেয়—অজ্ঞানতা এবং ধর্মান্ধতা কখনও সত্যকে বিনষ্ট করিতে পারে না।

বক্তা এই ধরনের যুক্তি-পুরঃসর প্রায় দুই ঘণ্টা বলিয়া চলেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেন, 'আসুন, আমরা কাহারও ধ্বংসের চেষ্টা না করিয়া একে অপরকে সাহায্য করি।'

২৬. পুনর্জন্ম

[মেমফিস্ শহরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৯ জানুআরী প্রদত্ত; ২০ জানুআরীর 'অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।]

পীত-আলখল্লা ও পাগড়ি-পরিহিত সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ পুনরায় গতরাত্রে 'লা স্যালেট একাডেমী'তে বেশ বড় এবং সমঝদার একটি সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় ছিল 'আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ'। বলিতে গেলে এই বিষয়টির আলোচনায় কানন্দের বোধ করি স্বপক্ষসর্মথনে যত সুবিধা হইয়াছিল, এমন আর অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। প্রাচ্য জাতি- সমূহের ব্যাপকভাবে স্বীকৃত বিশ্বাসগুলির মধ্যে পুনর্জন্মবাদ অন্যতম। স্বদেশে কিম্বা বিদেশে এই বিশ্বাসের পক্ষ-সমর্থন করিতে তাহারা সর্বদাই প্রস্তুত, কানন্দ যেমন তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেনঃ

আপনারা অনেকেই জানেন না যে, পুনর্জন্মবাদ প্রাচীন ধর্মসমূহের একটি অতি পুরাতন বিশ্বাস। য়াহুদীজাতির অন্তর্গত ফ্যারিসীদের মধ্যে এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তকগণের মধ্যে ইহা সুপরিচিত ছিল। আরবদিগের ইহা একটি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে ইহা এখনও টিকিয়া আছে। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া আসিয়াছিল। বিজ্ঞান তো বিভিন্ন জড়শক্তিকে বুঝিবার প্রয়াস মাত্র। পাশ্চাত্য দেশের আপনারা মনে করেন, পুনর্জন্মবাদ নৈতিক আদর্শকে ব্যাহত করে। পুনর্জন্মবাদের বিচার-ধারা এবং যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক দিকগুলির পুরাপুরি আলোচনার জন্য আমদিগকে গোড়া হইতে সবটা বিষয় পরীক্ষা করিতে হইবে। আমরা এই বিশ্বজগতের একজন ন্যায়বান্ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কিন্তু সংসারের দিকে তাকাইয়া দেখিলে ন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায়ই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার সারা জীবনে অনুকূল অবস্থাগুলি যেন প্রস্তুত হইয়া তাহার হাতের মধ্যে আসিয়া পড়ে, সব কিছুই তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং উন্নতির সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে আর একজন হয়তো এমন পরিবেষ্টনীতে পৃথিবীতে আসে যে, জীবনের প্রতি ধাপে

তাহাকে অপর সকলের প্রতিপক্ষতা করিতে হয়। নৈতিক অধঃপাতে গিয়া, সমাজচ্যুত হইয়া সে পৃথিবী হইতে বিদায় লয়। মানুষের ভিতর সুখ-শান্তির বিধানে এত তারতম্য কেন?

জন্মান্তরবাদ আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসসমূহের এই গরমিলগুলির সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে। এই মতবাদ আমাদিগকে দুর্নীতিপরায়ণ না করিয়া ন্যায়ের ধারণায় উদ্বুদ্ধ করে। পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তোমরা হয়তো বলিবে, উহা ভগবানের ইচ্ছা। কিন্তু ইহা আদৌ সদুত্তর নয়। ইহা অবৈজ্ঞানিক। প্রত্যেক ঘটনারই একটা কারণ থাকে। একমাত্র ঈশ্বরকেই সকল কার্য কারণের বিধাতা বলিলে তিনি এক ভীষণ দুর্নীতিশীল ব্যক্তি হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু জড়বাদও পূর্বোক্ত মতবাদেরই মত অযৌক্তিক। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার এলাকার সর্বত্রই কার্য-কারণ-ভাব ওতপ্রোত। অতএব এই দিক্ দিয়া আত্মার জন্মান্তরবাদ প্রয়োজনীয়। আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ইহা কি আমাদের প্রথম জন্ম? সৃষ্টি মানে কি শূন্য হইতে কোন কিছুর উৎপত্তি? ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে ইহা অসম্ভব মনে হয়। অতএব বলা উচিত, সৃষ্টি নয়—অভিব্যক্তি।

অবিদ্যমান কারণ হইতে কোন কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। আমি যদি আগুনে আঙুল দিই, সঙ্গে সঙ্গে উহার ফল ফলিবে—আঙুল পুড়াইয়া যাইবে। আমি জানি আগুনের সহিত আঙুলের সংস্পর্শ-ক্রিয়াই হইল দাহের কারণ। এইরূপে বিশ্বপ্রকৃতি ছিল না—এমন কোন সময় থাকা অসম্ভব, কেননা প্রকৃতির কারণ সর্বদাই বর্তমান। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার কর যে, এমন এক সময় ছিল, কোন প্রকার অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে—এই-সব বিপুল জড়-সমষ্টি কোথায় ছিল? সম্পূর্ণ নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রচণ্ড অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হইবে। হইা অসম্ভব। পুরাতন বস্তু নূতন করিয়া গড়া চলে, কি

ন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নূতন কিছু আমদানী করা চলে না।ইহা ঠিক যে, পুনর্জন্মবাদ গণিত দিয়া প্রমাণ করা চলে না। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে অনুমান ও মতবাদের বলবত্তা প্রত্যক্ষের মত নাই সত্য, তবে আমার বক্তব্য এই যে, জীবনের ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য

মানুষের বুদ্ধি ইহা অপেক্ষা প্রশস্ততর অন্য কোন মতবাদ আর উপস্থাপিত করিতে পারে নাই।

মিনিয়াপলিস্ শহর হইতে ট্রেনে আসিবার সময় আমার একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। গাড়ীতে জনৈক গো-পালক ছিল। লোকটি একটু রুক্ষপ্রকৃতি এবং ধর্ম বিশ্বাসে গোঁড়া প্রেসবিটেরিয়ান। সে আমার কাছে আগাইয়া আসিয়া জানিতে চাহিল, আমি কোথাকার লোক। আমি বলিলাম, ভারতবর্ষের। তখন সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ধর্ম কি?' আমি বলিলাম, হিন্দু। সে বলিল, 'তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।' আমি তাহাকে পুনর্জন্মবাদের কথা বলিলাম। শুনিয়া সে বলিলঃ সে বরাবরই এই মতবাদে বিশ্বাসী, কেননা একদিন সে যখন কাঠ কাটিতেছিল, তখন তাহার ছোট বোনটি তাহার (গো-পালকের) পোষাক পরিয়া তাহাকে বলে যে, সে আগে পুরুষমানুষ ছিল। এই জন্যই সে আত্মার শরীরান্তর-প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে। এই মতবাদের মূল সূত্রটি এইঃ মানুষ যদি ভাল কাজ করে, তাহা হইলে তাহার উচ্চতর ঘরে জন্ম হইবে, আর মন্দ কাজ করিলে নিকৃষ্ট গতি।

এই মতবাদের আর একটি চমৎকার দিক্ আছে—ইহা শুভ প্রবৃত্তির প্ররোচক। একটি কাজ যখন করা হইয়া যায়, তখন তো আর উহাকে ফিরান যায় না। এই মত বলে, আহা যদি ঐ কাজটি আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতে! যাহা হউক, আগুনে আর হাত দিও না। প্রত্যেক মুহূর্তে নূতন সুযোগ আসিতেছে। উহাকে কাজে লাগাও।

বিবে কানন্দ এইভাবে কিছুকাল বলিয়া চলেন। শ্রোতারা ঘন ঘন করতালি দিয়া প্রশংসাধ্বনি করেন।

স্বামী বিবে কানন্দ পুনরায় আজ বিকাল ৪টায় লা স্যালেট একাডেমীতে 'ভারতীয় আচার-ব্যবহার' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।

২৭. তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব

[মেমফিস্ শহরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ২১ জানুআরী প্রদত্ত; 'অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।]

স্বামী বিবে কানন্দ গত রাত্রে 'ইয়ং মেন্‌স্ হিব্রু এসোসিয়েশন হল'-এ 'তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এখানে তিনি যতগুলি ভাষণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট। এই সুপণ্ডিত ভদ্রমহোদয়ের প্রতি এই শহরের অধিবাসীবৃন্দের শ্রদ্ধা এই বক্তৃতাটি দ্বারা নিঃসন্দেহে অনেক বাড়িয়াছে। এ পর্যন্ত বিবে কানন্দ কোন না কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উপকারের জন্য বক্তৃতা করিয়াছেন। ঐ-সকল প্রতিষ্ঠান যে তাঁহার নিকট আর্থিক সহায়তা পাইয়াছে তাহাও ঠিক। গত রাত্রের বক্তৃতার দর্শনী কিন্তু তাঁহার নিজের কাজের জন্য। এই বক্তৃতাটির পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা করেন বিবে কানন্দের বিশিষ্ট বন্ধু ও ভক্ত মিঃ হিউ এল ব্রিঙ্কলী। এই প্রাচ্যদেশীয় মনীষীর শেষ বক্তৃতা শুনিতে গত রাত্রিতে প্রায় দুইশত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

বক্তা তাঁহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রথমে এই প্রশ্নটি তুলেনঃ ধর্মের নানা মতবাদ সত্ত্বেও ধর্মে ধর্মে কি বাস্তবিকই খুব পার্থক্য আছে? বক্তার মতেঃ না, বর্তমান যুগে বিশেষ পার্থক্য আর নাই। তিনি সকল ধর্মের ক্রমবিকাশ আদিম কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখান যে, আদিম মানুষ অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা প্রকারের ধারণা পোষণ করিত, কিন্তু মানুষের নৈতিক ও মানসিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-ধারণার এই-সকল বিভিন্নতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে এবং অবশেষে উহা একেবারেই মিলাইয়া যায়। বর্তমানে শুধু একটি মত সর্বত্র প্রবল—ঈশ্বরের নির্বিশেষ অস্তিত্ব।

বক্তা বলেনঃ এমন কোন বর্বর জাতি নাই, যাহারা কোন না কোন দেবতায় বিশ্বাস না করে। উহাদের মধ্যে প্রেমের ভাব খুব বলবান্ নয়, বরং উহারা জীবন যাপন করে ভয়ের পটভূমিতে। তাহাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কল্পনায় একটি ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ 'দেবতা' খাড়া

হয়। এই 'দেবতা'র ভয়ে তাহারা সর্বদাই কম্পমান। তাহার নিজের যাহা ভাল লাগে, ঐ দেবতারও তাহা ভাল লাগিবে, সে ধরিয়া লয়। সে নিজে যাহা পাইয়া সুখী হয়, সে ভাবে–উহা দেবতারও ক্রোধ শান্ত করিবে। স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধতা করিয়াও সে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে।

বক্তা ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণ করেনঃ অসভ্য মানুষ পিতৃপুরুষের পূজা হইতে হাতীদের পূজায় পৌঁছায় এবং পরে

বজ্র এবং ঝড়ের দেবতা প্রভৃতি নানা দেবতার উপাসনায়। এই অবস্থায় মানুষের ধর্ম ছিল বহুদেববাদ। বিবে কানন্দ বলেনঃ 'সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য, সূর্যাস্তের চমৎকারিতা, নক্ষত্রখচিত আকাশের রহস্যময় দৃশ্য এবং বজ্র ও বিদ্যুতের অদ্ভুত অলৌকিকতা আদিম মানুষের মনে একটি গভীর আবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা সে ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। ফলে চোখের সম্মুখে উপস্থিত প্রকৃতির এইসব বিশাল ঘটনার নিয়ামক একজন উচ্চতর এবং মহাশক্তিমান্ কেহ আছেন–এই ধারণাই তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল।'

ইহার পর আসিল আর একটি পর্যায়–একেশ্বরবাদের কাল। বিভিন্ন দেবতারা অদৃশ্য হইয়া একটি মাত্র সত্তায় মিশিয়া গেলেন–দেবতার দেবতা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরে। ইহার পর বক্তা আর্যজাতিকে এই পর্যায় পর্যন্ত অনুসরণ করিলেন। এই পর্যায়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কথা হইল–'আমরা ঈশ্বরের সত্তায় বাঁচিয়া আছি, তাঁহারই মধ্যে চলিতেছি ফিরিতেছি। তিনিই গতিস্বরূপ।' ইহার পর আর একটি কাল আসিল, দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে সর্বেশ্বরবাদের কাল বলা হয়। আর্যজাতি বহুদেবতাবাদ, একেশ্বরবাদ এবং বিশ্বজগৎই ঈশ্বর–সর্বেশ্বরবাদের এই মতও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, 'আমার অন্তরাত্মাই একমাত্র সত্য। আমার প্রকৃতি হইল সত্তাস্বরূপ, যত কিছু বিস্তৃতি, তাহা আমাতেই।'

বিবে কানন্দ অতঃপর বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গে আসেন। তিনি বলেন যে, বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই, অস্বীকারও করে নাই। উপদেশ প্রার্থনা করিলে বুদ্ধ শুধু

বলিতেন, 'দুঃখ তো দেখিতে পাইতেছ; বরং উহা হ্রাস করিবার চেষ্টা কর।' বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর কাছে দুঃখ সর্বদাই বিদ্যমান।

বক্তা বলেন, মুসলমানরা হিব্রুদের 'প্রাচীন সমাচার' এবং খ্রীষ্টানদের 'নূতন সমাচার' বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহারা খ্রীষ্টানদের পছন্দ করেন না, কেননা তাঁহাদের ধারণা যে, খ্রীষ্টানরা প্রাচীন ধর্মমতের বিরোধিতা করেন এবং মানুষ-পূজা শিক্ষা দেন। মহম্মদ তাঁহার মতানুবর্তীদের তাঁহার নিজের কোন ছবি রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

বক্তা বলেনঃ এখন এই প্রশ্ন উঠে যে, এই-সকল বিভিন্ন ধর্মের সবগুলিই কি সত্য, না কতকগুলি খাঁটি, আর বাকীগুলি ভুয়া? সব ধর্মই একটি সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে–একটি চরম অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব। ধর্মের লক্ষ্য হইল একত্ব। আমরা যে চারি পাশে ঘটনারাশির বৈচিত্র্য দেখি, উহারা একত্বেরই অনন্ত অভিব্যক্তি। ধর্মসমূহকে যদি তলাইয়া বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, মানুষের অভিযান–মিথ্যা হইতে সত্যে নয়, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।

ধরুন জনৈক ব্যক্তি একটি মাত্র মাপের জামা লইয়া অনেকগুলি লোকের কাছে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, ঐ জামা তাহাদের গায়ে লাগিবে না। তখন লোকটি উত্তর করিল, তাহা হইলে তোমরা বিদায় হও,

জামা পরিয়া কাজ নাই। কোন পাদ্রীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে-সব (খ্রীষ্টান) সম্প্রদায় তাঁহার মতবাদ ও বিশ্বাসগুলি মানে না, তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে? তিনি উত্তর দিলেন, 'ওঃ, উহারা খ্রীষ্টানই নয়।' কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল উপদেশও সম্ভব। আমাদের নিজেদের প্রকৃতি, পরস্পরের প্রতি প্রেম এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ–এইগুলি হইতে আমরা প্রশস্ততর শিক্ষা পাই। নদীর বুকে যে জলস্রোতের আবর্ত, ঐগুলি যেমন নদীর প্রাণের পরিচায়ক, ঐগুলি না থাকিলে নদী যেমন মরিয়া যায়, সেইরূপ ধর্মকে বেড়িয়া নানা বিশ্বাস ও মত ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তিরই ইঙ্গিত। এই মতবৈচিত্র্য যদি ঘুচিয়া যায়, তাহা

হইলে ধর্মচিন্তারও মরণ ঘটিবে। গতি আবশ্যক। চিন্তা হইল মনের গতি, এই গতি থামিয়া যাওয়া মৃত্যুর সূচনা।

একটি বুদ্বুদকে যদি এক গ্লাস জলের তলদেশে আটকাইয়া রাখ, উহা তৎক্ষণাৎ উপরের অনন্ত বায়ুমণ্ডলে যোগ দিবার জন্য আন্দোলন শুরু করিবে। জীবাত্মা সম্বন্ধে এই একই কথা। উহা ভৌতিক দেহ থেকে মুক্তি লাভ করিতে এবং নিজের শুদ্ধ স্বভাব ফিরিয়া পাইতে অনবরত চেষ্টা করিতেছে। উহার আকাঙ্ক্ষা হইল স্বকীয় বাধাহীন অনন্ত বিস্তার পুনরায় লাভ করা। আত্মার এই প্রচেষ্টা সর্বত্রই সমান। খ্রীষ্টান বল, বৌদ্ধ বল, মুসলমান বল, অথবা সংশয়বাদী কিম্বা ধর্মযাজকই বল, প্রত্যেকের মধ্যে জীবাত্মা এই মুক্তির প্রয়াসে তৎপর। মনে কর, একটি নদী হাজার মাইল আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথ কত কষ্টে অতিক্রম করিয়া অবশেষে সমুদ্রে পড়িয়াছে, আর একজন মানুষ ঐ সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া নদীকে আদেশ করিতেছেঃ হে নদী, তোমার উৎপত্তি স্থলে ফিরিয়া যাও এবং নূতন একটি সিধা রাস্তা ধরিয়া সাগরে এস। এই মানুষটি কি নির্বোধ নয়? য়াহুদী তুমি, তুমি হইলে জাইঅন (Zion) শৈল হইতে নিঃসৃত একটি নদী। কিন্তু আমি, আমি নামিয়া আসিতেছি উত্তুঙ্গ হিমালয় শৃঙ্গ হইতে। আমি তোমাকে বলিতে পারি না—যাও, তুমি ফিরিয়া যাও, তুমি ভুল পথ ধরিয়াছ। আমার পথে পুনরায় বহিয়া এস। এইরূপ উক্তি বোকামী ছাড়া বিষম ভুলও। নিজের বিশ্বাস আঁকড়াইয়া থাক। সত্য কখনও বিলুপ্ত হয় না। পুঁথিপত্র নষ্ট হইতে পারে, জাতিসমূহও সংঘর্ষে নিশ্চিহ্ন হইতে পারে, কিন্তু সত্য বাঁচিয়া থাকে। পরে কোন মানুষ আসিয়া উহাকে আবিষ্কার করে এবং উহা সমাজে পুনঃ প্রবর্তিত হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, ভগবান কী চমৎকার রীতিতে তাঁহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান অনবরত মানুষের কাছে অভিব্যক্ত করিতেছেন!

২৮. ‘এশিয়ার আলোক’—বুদ্ধদেবের ধর্ম

[ডেট্রয়েট শহরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৯ মার্চ প্রদত্ত; ‘ডেট্রয়েট ট্রিবিউন’ পত্রিকায় প্রকাশিত।]

গতরাত্রে অডিটোরিয়ামে বিবে কানন্দ ১৫০ জন শ্রোতার নিকট ‘এশিয়ার আলোক’—বুদ্ধদেবের ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মাননীয় ডন এম. ডিকিনসন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বক্তার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেন—কে বলিতে পারে যে, এই ধর্মমতটি ঈশ্বরাদিষ্ট, আর অন্যটি নিকৃষ্ট? অতীন্দ্রিয়তার বিভাগ-রেখা কে টানিতে পারে?

বিবে কানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগুলির বিশদ পর্যালোচনা করেন। তিনি যজ্ঞ- বেদীতে বহুল প্রাণিবধের কথা বলিয়া বুদ্ধের জন্ম এবং জীবন-কাহিনী বর্ণনা করেন। সৃষ্টির কারণ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুদ্ধের মনে যে দুরূহ সমস্যাগুলি উঠিয়াছিল, ঐগুলির সমাধানের জন্য তিনি যে তীব্র সাধনা করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এ-সকল বিষয় বক্তা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, বুদ্ধ অপর সকল মানুষের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁহার সম্বন্ধে কি মিত্র, কি শত্রু—কেহ কখনও বলিতে পারে না যে, তিনি সকলের হিতের জন্য ছাড়া একটিও নিঃশ্বাস লইয়াছেন বা এক টুকরা রুটি খাইয়াছেন।

কানন্দ বলেন, আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ বুদ্ধ কখনও প্রচার করেন নাই। তবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমুদ্রে যেমন একটি ঢেউ উঠিয়া মিলাইয়া যাইবার সময় পরবর্তী ঢেউটিতে তাহার শক্তি সংক্রামিত করিয়া যায়, সেইরূপ একটি জীব তাহার উত্তরকালীনে নিজের

শক্তি রাখিয়া যায়। বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনও প্রচার করেন নাই; আবার ঈশ্বর যে নাই, তাহাও বলেন নাই।

তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমরা সৎ হইব কেন?' বুদ্ধ উত্তর দিলেন, 'কারণ তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রে সদ্‌ভাব পাইয়াছ। তোমাদেরও উচিত পরবর্তীদের জন্য কিছু সদ্‌ভাব রাখিয়া যাওয়া।' সংসার সমষ্টিকৃত সাধুতার সম্প্রসারের জন্যই আমাদের প্রত্যেকের সাধু আচরণ বিধেয়।

বুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি কাহারও নিন্দা করেন নাই, নিজের জন্য কিছু দাবী করেন নাই। নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। মৃত্যুশয্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি বা অপর কেহই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না। কাহারও উপর নির্ভর করিও না। নিজের মুক্তি নিজেই সম্পাদন কর।'

মানুষে মানুষে এবং মানুষে ও ইতরপ্রাণীতে অসাম্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল প্রাণীই সমান। তিনিই প্রথম মদ্যপান বন্ধ করার নীতি উপস্থাপিত করেন। তাঁহার শিক্ষাঃ সৎ হও, সৎ কাজ কর। যদি ঈশ্বর থাকেন, সাধুতার দ্বারা তাঁহাকে লাভ কর। যদি ঈশ্বর নাও থাকেন, তবুও সাধুতাই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। মানুষের যাবতীয় দুঃখের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাহার সমুদয় সদাচরণের জন্য প্রশংসাও তাহারই প্রাপ্য।

বুদ্ধই প্রথম ধর্মপ্রচারক দলের উদ্ভাবক। ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদিগের পরিত্রাতারূপে তাঁহার আবির্ভাব। উহারা তাঁহার দার্শনিক মত বুঝিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিত।

উপসংহারে কানন্দ বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি। ক্যাথলিক সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম হইতেই উদ্ভূত।

২৯. মানুষের দেবত্ব

‘এডা রেকর্ড’, ২৮ ফেব্রুআরী, ১৮৯৪

গত শুক্রবার (২২ ফেব্রুআরী) অপেরা হাউস-এ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ‘মানুষের দেবত্ব’ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া ঘর-ভর্তি শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। বক্তা বলেন, সকল ধর্মের মূল ভিত্তি হইল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাতে বিশ্বাস–যে আত্মা জড়পদার্থ ও মন দুয়েরই অতিরিক্ত কিছু। জড়বস্তুর অস্তিত্ব অপর কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে। মনও পরিবর্তনশীল বলিয়া অনিত্য। মৃত্যু তো একটি পরিবর্তন মাত্র।

আত্মা মনকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া শরীরকে চালিত করে। মানবাত্মা যাহাতে শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়, এই চেষ্টা করা কর্তব্য। মানুষের স্বরূপ হইল নির্মল ও পবিত্র, কিন্তু অজ্ঞান আসিয়া মেঘের মত উহাকে যেন আছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় ধর্মের দৃষ্টিতে প্রত্যেক আত্মাই তাহার প্রকৃত শুদ্ধ স্বরূপ ফিরিয়া পাইতে চেষ্টা করিতেছে। অধিকাংশ ভারতবাসী আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্য, ইহা আমাদের প্রচার করা নিষিদ্ধ।

বক্তা বলেন, “আমি হইলাম চৈতন্যস্বরূপ, জড় নই। প্রতীচ্যের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর পরও আবার স্থূল শরীরে বাস করিবার আশা পোষণ করে। আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, এইরূপ কোন অবস্থা থাকিতে পারে না। আমরা ‘পরিত্রাণে’র বদলে ‘আত্মার মুক্তি’র কথা বলি।”

মূল বক্তৃতাটিতে মাত্র ৩০ মিনিট লাগিয়াছিল, তবে বক্তৃতার ব্যবস্থাপক সমিতির অধ্যক্ষ ঘোষণা করেন, বক্তৃতার শেষে কেহ প্রশ্ন করিলে বক্তা উহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন। এই সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যেমন ছিলেন ধর্মযাজক, অধ্যাপক, ডাক্তার ও দার্শনিক, তেমনি ছিলেন সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, সৎলোক আবার দুষ্ট লোক। অনেকে লিখিয়া তাঁহাদের প্রশ্ন উপস্থাপিত

করেন। অনেকে আবার তাঁহাদের আসন হইতে উঠিয়া বক্তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেন। বক্তা সকলকেই সৌজন্যের সহিত উত্তর দেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তাকে খুব হাসাইয়া তুলেন। এক ঘণ্টা এইরূপ চলিবার পর বক্তা আলোচনা সমাপ্তির অনুরোধ জানান। তখনও বহু লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকী। বক্তা অনেকগুলির জবাব কৌশলে এড়াইয়া যান। যাহা হউক তাঁহার আলোচনা হইতে হিন্দুধর্মের বিশ্বাস ও শিক্ষাসমূহ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আরও কয়েকটি কথা আমরা লিপিবদ্ধ করিলামঃ

হিন্দুরা মানুষের পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাহদের ভগবান্ কৃষ্ণ উত্তর ভারতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এক শুদ্ধভাবা নারীর৯ গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণের কাহিনী বাইবেলে কথিত খ্রীষ্টের জীবনেতিহাসের অনুরূপ, তবে কৃষ্ণ নিহত হন একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায়। হিন্দুরা মানবাত্মার প্রগতি এবং দেহান্তর-প্রাপ্তি স্বীকার করেন। আমাদের আত্মা পূর্বে পাখী, মাছ বা অপর কোন ইতরপ্রাণীর দেহে আশ্রিত ছিল, মরণের পরে আবার অন্য কোন প্রাণী হইয়া জন্মাইবে। একজন জিজ্ঞাসা করেন, এই পৃথিবীতে আসিবার আগে এই সব আত্মা কোথায় ছিল। বক্তা বলেন অন্যান্য লোকে। আত্মা সকল অস্তিত্বের অপরিবর্তনীয় আধার। এমন কোন কাল নাই, যখন ঈশ্বর ছিলেন না এবং সেইজন্য এমন কোন কাল নাই যখন সৃষ্টি ছিল না। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ব্যক্তি-ভগবান্ স্বীকার করেন না। বক্তা বলেন, তিনি বৌদ্ধ নন। খ্রীষ্টকে যেভাবে পূজা করা হয়, মহম্মদকে সেইভাবে করা হয় না। মহম্মদ খ্রীষ্টকে মানিতেন, তবে খ্রীষ্ট যে ঈশ্বর—ইহা অস্বীকার করিতেন। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ক্রমবিকাশের ফলে ঘটিয়াছে, বিশেষ নির্বাচন (নূতন সৃষ্টি) দ্বারা নয়। ঈশ্বর হইলেন স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার সৃষ্টি। হিন্দুধর্মে 'প্রার্থনা'র রীতি নাই—এক শিশুদের জন্য ছাড়া এবং তাহাও শুধু মনের উন্নতির উদ্দেশ্যে। পাপের সাজা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ঘটিয়া থাকে। আমরা যে-সব কাজ করি, তাহা আত্মার নয়, অতএব কাজের ভিতর মলিনতা ঢুকিতে পারে। আত্মা পূর্ণস্বরূপ, শুদ্ধস্বরূপ। উহার কোন বিশ্রাম-স্থানের প্রয়োজন হয় না। জড়পদার্থের কোন ধর্ম আত্মাতে নাই। মানুষ যখন নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে, তখনই সে পূর্ণাবস্থা লাভ করে। ধর্ম হইল আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি। যে যত আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত, সে তত সাধু। ভগবানের

শুদ্ধসত্তার অনুভবের নামই উপাসনা। হিন্দুধর্ম বহিঃপ্রচারে বিশ্বাস করে না। উহার শিক্ষা এই যে—মানুষ যেন ভগবানকে ভালবাসার জন্যই ভালবাসে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণের সময় নিজেকে যেন সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়। পাশ্চাত্যের লোক অতিরিক্ত কর্মপ্রবণ। বিশ্রামও সভ্যতার একটি অঙ্গ। হিন্দুরা নিজেদের দুর্বলতাগুলি ঈশ্বরের উপর চাপায় না। সকল ধর্মের পারস্পরিক মিলনের একটি প্রবণতা এখন দেখা যাইতেছে।

৩০. হিন্দু সন্ন্যাসী

‘বে সিটি টাইমস্’, ২১ মার্চ ১৮৯৪

গতকল্য সন্ধ্যায় অপেরা হাউস-এ স্বামী বিবে কানন্দ যে চিত্তাকর্ষক ভাষণটি দিয়াছেন, ঐরূপ বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ এই শহরের (বে সিটি) লোক কদাচিৎ পাইয়া থাকে। বক্তা ভদ্রলোক, ভারতবর্ষের অধিবাসী। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর সি. টি নিউকার্ক যখন শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বক্তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তখন অপেরা হাউসের নীচের তলার প্রায় অর্ধেকটা ভরিয়া গিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বক্তা এই দেশের লোককে সর্বশক্তিমান্ ডলারের ভজনা করিবার জন্য সমালোচনা করেন। ভারতে জাতিভেদ আছে সত্য, কিন্তু খুনী লোক কখনও সমাজের শীর্ষস্থানে যাইতে পারে না। কিন্তু এদেশে যদি সে দশলক্ষ ডলারের মালিক হয়, তাহা হইলে সে অপর যে-কোন ব্যক্তিরও সমান। ভারতে একবার যদি কেহ গুরুতর অপরাধ করিয়া বসে, তাহা হইলে বারবার সে হীন থাকিয়া যায়। হিন্দুধর্মের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল—অন্যান্য ধর্ম ও বিশ্বাসসমূহের প্রতি সহিষ্ণুতা। অন্যান্য প্রাচ্য দেশের ধর্ম অপেক্ষা ভারতবর্ষের ধর্মের উপরই মিশনরীদের আক্রোশ বেশী, কেননা হিন্দুরা তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে বাধা দেয় না। এখানে হিন্দুরা তাহাদের ধর্মের যাহা একটি প্রধান শিক্ষা—সহিষ্ণুতা, উহাই প্রতিপালন করিতেছে, বলিতে পারা যায়। কানন্দ একজন উচ্চশিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। আমরা শুনিয়াছি ডেট্রয়েট-এ কানন্দকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিলঃ হিন্দুরা নদীতে তাহাদের শিশুসন্তান নিক্ষেপ করে কিনা? কানন্দ উত্তর দেনঃ না তাহারা ঐরূপ

করে না, পাশ্চাত্যদেশের মত ডাইনী সন্দেহ করিয়া স্ত্রীলোকেদেরও তাহারা দাহ করে না। বক্তা আজ রাত্রে স্যাগিন শহরে বক্তৃতা করিবেন।

৩১. ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ

'বে সিটি ডেলী ট্রিবিউন', ২১ মার্চ, ১৮৯৪

বে সিটিতে গতকল্য একজন খ্যাতনামা অতিথি আসিয়াছেন। ইনি হইলেন সেই বহু-আলোচিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ। তিনি ডেট্রয়েট হইতে এখানে দ্বিপ্রহরে পৌঁছিয়া তখনই ফ্রেজার হাউসে চলিয়া যান। ডেট্রয়েটে তিনি সেনেটর পামারের অতিথি ছিলেন। আমাদের পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধি কালই ফ্রেজার হাউস-এ কানন্দের সহিত দেখা করেন। তাঁহার চেহারা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি প্রায় ছয় ফুট উঁচু, ওজন বোধকরি ১৮০ পাউণ্ড, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনে আশ্চর্য-রকম সামঞ্জস্য। তাঁহার গায়ের রঙ উজ্জ্বল অলিভবর্ণ, কেশ ও চোখ সুন্দর কালো। মুখ পরিষ্কার কামান। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর খুব মিষ্ট এবং সুনিয়মিত। তিনি চমৎকার ইংরেজী বলেন, বস্তুতঃ অধিকাংশ আমেরিকানদের চেয়ে ভাল বলেন। তাঁহার ভদ্রতাও বেশ উল্লেখযোগ্য।

কানন্দ তাঁহার স্বদেশের কথা—তথা তাঁহার নিজের আমেরিকার অভিজ্ঞতা কৌতুকের সহিত বর্ণনা করেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগর হইয়া আমেরিকায় আসিলেন, ফিরিবেন অ্যাটলাণ্টিকের পথে। বক্তা বলিলেন, 'আমেরিকা একটি বিরাট দেশ, তবে আমি এখানে বরাবর থাকিতে চাই না। আমেরিকানরা অত্যধিক অর্থচিন্তা করে, অন্য সব কিছুর আগে ইহার স্থান। আপনাদের এখনও অনেক কিছু শিখিতে হইবে। আপনাদের জাতি যখন আমাদের জাতির ন্যায় প্রাচীন হইবে, তখন আপনাদের বিজ্ঞতা বাড়িবে। চিকাগো আমার খুব ভাল লাগে। ডেট্রয়েট জায়গাটিও সুন্দর।'

আমেরিকায় কত দিন থাকিবেন, জিজ্ঞাসা করিলে কানন্দ বলেন, 'তাহা আমি জানি না। তোমাদের দেশের অধিকাংশই আমি দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি। ইহার পর আমি পূর্বাঞ্চলে যাইব এবং বষ্টন ও নিউ ইয়র্কে কিছুকাল থাকিব। বষ্টনে আমি গিয়াছি, তবে থাকা হয় নাই। আমেরিকা দেখা হইলে ইওরোপে যাইব। ইওরোপ দেখিবার আমার খুব ইচ্ছা। ওখানে কখনও যাই নাই।'

নিজের সম্বন্ধে এই প্রাচ্য সন্ন্যাসী বলেন, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ওখানকারই একটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সন্ন্যাসী বলিয়া দেশের সর্বত্রই তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হয়। সব সময়েই তিনি সমগ্র জাতির অতিথি।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৮॥ কোটি, তন্মধ্যে ৬॥ কোটি হইল মুসলমান, বাকী অধিকাংশ হিন্দু। ভারতে ৬॥ লক্ষ খ্রীষ্টান আছে, তাহার ভিতর অন্ততঃ ২॥ লক্ষ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের দেশের লোক সচরাচর খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে না। নিজেদের ধর্মেই তাহারা পরিতৃপ্ত। তবে কেহ কেহ আর্থিক সুবিধার জন্য খ্রীষ্টান হয়। মোট কথা ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের খুব স্বাধীনতা আছে। আমরা বলি, যাহার যে-ধর্মে অভিরুচি, সে তাহাই গ্রহণ করুক। আমরা চতুর জাতি। রক্তপাতে আমাদের আস্থা নাই। আমাদের দেশে দুষ্ট লোক আছে বৈকি, বরং তাহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন তোমাদের দেশে। জনসাধারণ দেবদূত হইয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিবে কানন্দ আজ রাত্রে স্যাগিনে বক্তৃতা করিবেন।

৩২. গতরাত্রের বক্তৃতা

গত সন্ধ্যায় বক্তৃতা আরম্ভের সময় অপেরা হাউসের নীচের তলা প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল। ঠিক ৮।১৫ মিনিটে বিবে কানন্দ তাঁহার সুন্দর প্রাচ্য পরিচ্ছদে বক্তৃতা-মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সি. টি নিউকার্ক কিছু বলিয়া বক্তার পরিচয় দিলেন।

আলোচনার প্রথমাংশ ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে ও জন্মান্তরবাদের ব্যাখ্যামূলক। দ্বিতীয় বিষয়টির প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, বিজ্ঞান-জগতে শক্তি-সাতত্যবাদের যাহা বনিয়াদ, জন্মান্তরবাদেরও তাহাই। শক্তি-সাতত্যবাদ প্রথম উপস্থাপিত করেন ভারতবর্ষেরই একজন দার্শনিক। ইঁহারা আগন্তুক সৃষ্টিতে বিশ্বাস করিতেন না। 'সৃষ্টি' বলিতে শূন্য হইতে কোন কিছু উৎপন্ন করা বুঝায়। ইহা যুক্তির দিক্ দিয়া অসম্ভব। কালের যেমন আদি নাই, সৃষ্টিরও সেইরূপ কোন আদি নাই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি আদ্যন্তহীন দুইটি সমান্তরাল রেখা। এই দার্শনিক মত অনুসারে 'সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ছিল, আছে এবং থাকিবে।' হিন্দু দর্শনের মতে আমরা যাহাকে 'শাস্তি' বলি—উহা কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমরা যদি আগুনে হাত দিই, হাত পুড়িয়া যায়। উহা একটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। জীবনের ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্তমান অবস্থা দ্বারা নিরূপিত হয়। হিন্দুরা ঈশ্বরকে শাস্তিদাতা বলিয়া মনে করে না। বক্তা বলেন, 'তোমরা এই দেশে—যে রাগ করে না, তাহার প্রশংসা কর এবং যে রাগ করে, তাহার নিন্দা করিয়া থাক। তবুও দেশ জুড়িয়া হাজার হাজার লোক ভগবানকে অভিযুক্ত করিতেছে—তিনি কুপিত হইয়াছেন বলিয়া। রোমনগরী যখন অগ্নিদগ্ধ হইতেছিল, তখন সম্রাট্ নীরো তাঁহার বেহালা বাজাইতেছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিয়া আসিতেছে। ঈশ্বরের অনুরূপ আচরণের জন্য তোমাদের মধ্যে হাজার হাজার ব্যক্তি তাঁহাকেও দোষ দিতেছ।'

হিন্দুধর্মে খ্রীষ্টধর্মের মত 'অবতারের মাধ্যমে পরিত্রাণ'—এইরূপ মত নাই। হিন্দুদের দৃষ্টিতে খ্রীষ্ট শুধু মুক্তির উপায়-প্রদর্শক। প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে দিব্যসত্তা রহিয়াছে, তবে উহা যেন একটি পর্দা দিয়া ঢাকা আছে। ধর্মের কাজ হইল—ঐ আবরণকে দূর করা। এই আবরণ-অপসারণকে খ্রীষ্টানরা বলেন, 'পরিত্রাণ', হিন্দুরা বলেন, 'মুক্তি'। ঈশ্বর বিশ্বসংসারের স্রষ্টা, পাতা এবং সংহর্তা।

বক্তা অতঃপর তাঁহার দেশের ধর্মসমূহের সমর্থনে কিছু আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সমগ্র রীতিনীতি যে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ হইতে লওয়া হইয়াছে,

ইহা সুপ্রমাণিত। পাশ্চাত্যের লোকেদের এখন ভারতের নিকট একটি জিনিষ শেখা উচিত—পরমত-সহিষ্ণুতা।

অন্যান্য যে সকল বিষয় তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন, তাহা হইল—খ্রীষ্টান মিশনরী, প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের প্রচার-উৎসাহ তথা অসহিষ্ণুতা, এই দেশে ডলার-পূজা এবং ধর্মযাজক-সম্প্রদায়। বক্তা বলেন, শেষোক্ত ব্যক্তিরা ডলারের জন্যই তাঁহাদের কাজে ব্রতী আছেন। যদি তাঁহাদিগকে বেতনের জন্য ভগবানের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কতদিন গীর্জার কাজে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা বলা যায় না। তারপর বক্তা ভারতের জাতিপ্রথা, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের সংস্কৃতি, মানব-মনের সাধারণ জ্ঞান এবং আরও কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিবার পর তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করেন।

৩৩. ধর্মের সমন্বয়

'স্যাগিন ইভনিং নিউজ', ২২ মার্চ, ১৮৯৪

গতকল্য সন্ধ্যায় সঙ্গীত একাডেমীতে বহু-আলোচিত হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ 'ধর্মের সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শ্রোতার সংখ্যা বেশী না হইলেও প্রত্যেকেই প্রখর মনোযোগ সহকারে তাঁহার আলোচনা শুনিয়াছেন। বক্তা প্রাচ্য পোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থিত হন। মাননীয় রোল্যাণ্ড কোনর অমায়িকভাবে বক্তার পরিচয় করাইয়া দেন। ভাষণের প্রথমাংশ বক্তা নিয়োগ করেন ভারতের বিভিন্ন ধর্ম এবং জন্মান্তরবাদের ব্যাখ্যানে। ভারতে ভূমির প্রথম বিজেতা আর্যগণ—খ্রীষ্টানরা যেমন নূতন দেশজয়ের পর করিয়া থাকে, সেইরূপ দেশের তৎকালীন অধিবাসীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছিলেন অমার্জিত সংস্কারের লোকগণকে সুসংস্কৃত করিতে। যে-সব স্বদেশবাসী স্নান করে না বা মৃত জন্তু ভক্ষণ করে, হিন্দুরা তাহাদের উপর বিরক্ত। উত্তর ভারতের অধিবাসী আর্যেরা

দক্ষিণাঞ্চলের অনার্যগণের উপর নিজেদের আচার ব্যবহার জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, তবে অনার্যেরা আর্যদের অনেক রীতিনীতি ধীরে ধীরে নিজেরাই গ্রহণ করে। ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশে বহু শতাব্দী হইতে কিছু কিছু খ্রীষ্টান আছে। স্পেনিয়ার্ডরা সিংহলে খ্রীষ্টধর্ম লইয়া যায়। তাহারা মনে করিত যে, অখ্রীষ্টানদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট।

বিভিন্ন ধর্ম যদি না থাকিত, তাহা হইলে একটি ধর্মও বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। খ্রীষ্টানদের নিজস্ব ধর্ম চাই। হিন্দুদেরও প্রয়োজন স্বকীয় ধর্মবিশ্বাস বজায় রাখা। যে-সব ধর্মের মূলে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তাহারা এখনও টিকিয়া আছে। খ্রীষ্টানরা য়াহুদীগণকে খ্রীষ্টধর্মে আনিতে পারে নাই কেন? পারসীকদেরও খ্রীষ্টান করিতে পারে নাই কি কারণে? মুসলমানরাও খ্রীষ্টান হয় না কেন? চীন এবং জাপানে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব নাই কেন? বৌদ্ধধর্ম—যাহাকে প্রথম প্রচারশীল ধর্ম বলিতে পারা যায়—কখনও তরবারির সাহায্যে অপরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে নাই, তবুও ইহা খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা দ্বিগুণ লোককে স্বমতে আনিয়াছে। মুসলমানেরা সর্বাপেক্ষা বেশী বল প্রয়োগ করিলেও তিনটি বড় প্রচারশীল ধর্মের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা কম। মুসলমানদের বিজয়ের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিরা রক্তপাত করিয়া ভূমি দখল করিতেছে, এই খবর আমরা প্রত্যহই পড়ি। কোন্ প্রচারক ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন? অত্যন্ত রক্তপিপাসু জাতিরা যে ধর্ম লইয়া এত জয়গান করে, তাহা তো খ্রীষ্টের ধর্ম নয়। য়াহুদী ও আরবগণ খ্রীষ্টধর্মের জনক, কিন্তু ইহারা খ্রীষ্টানদের দ্বারা কতই না নির্যাতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণকে বেশ যাচাই করিয়া দেখা হইয়াছে, খ্রীষ্টের আদর্শ হইতে তাঁহারা অনেক দূরে।

বক্তা বলেন, তিনি রূঢ় হইতে চান না, তবে অপরের চোখে খ্রীষ্টানদের কিরূপ দেখায়, তাহাই তিনি উল্লেখ করিতেছেন; যে-সব মিশনরী নরকের জ্বলন্ত গহ্বরের কথা প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে লোকে সন্ত্রাসের সহিত দেখিয়া থাকে। মুসলমানরা ভারতে তরবারি-ঝনৎকারে আক্রমণের উপর আক্রমণ-প্রবাহ চালাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ তাহারা

কোথায়? সব ধর্মই চূড়ান্ত দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পায়, তাহা হইল একটি চৈতন্যসত্তা। কোন ধর্মই ইহার পর আর কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মেই একটি মুখ্য সত্য আছে, আর কতকগুলি গৌণ ভাব উহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। যেন একটি মণি—একটি পেটিকার মধ্যে রাখা আছে। মুখ্য সত্যটি হইল মণি, গৌণ ভাবগুলি পেটিকা স্বরূপ। য়াহুদীর শাস্ত্রকে মানিলাম বা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থকে—ইহা গৌণ ব্যাপার।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে ধর্মের মূল সত্যের আধারটিও বদলায়, কিন্তু মূল সত্যটি অপরিবর্তিত রহিয়া যায়। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের যাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁহারা ধর্মের মূল সত্যকে ধরিয়া থাকেন। শুক্তির বাহিরের খোলাটি দেখিতে সুন্দর নয়, তবে ঐ খোলার ভিতর তো মুক্তা রহিয়াছে। পৃথিবীর সমুদয় জনসংখ্যার একটি অল্প অংশ মাত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার আগেই ঐ ধর্ম বহু মতবাদে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপই প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবীর নানা ধর্ম লইয়া যে একটি মহান্ ঐকতান বাদ্য চলিতেছে, উহার মধ্যে শুধু একটি যন্ত্রকে স্বীকার করিতে চাও কেন? সমগ্র বাদ্যটিকেই চলিতে দাও। বক্তা বিশেষ জোড় দিয়া বলেন পবিত্র হও, কুসংস্কার ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃতির আশ্চর্য সমন্বয় দেখিবার চেষ্টা কর। কুসংস্কারই ধর্মকে ছাপাইয়া গোল বাধায়। সব ধর্মই ভাল, কেননা মূল সত্য সর্বত্রই এক। প্রত্যেক মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ব্যবহার করুক, কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সকল পৃথক্ ব্যক্তিকে লইয়া একটি সুসমঞ্জস সমষ্টি গঠিত হয়। এই আশ্চর্য সামঞ্জস্যের অবস্থা ইতঃপূর্বেই রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ধর্মমত সম্পূর্ণ ধর্মসৌধটির গঠনে কিছু না কিছু যোগ করিয়াছে।

বক্তা তাঁহার ভাষণে বরাবর তাঁহার স্বদেশের ধর্মসমূহকে সমর্থন করিয়া যান। তিনি বলেন, রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যাবতীয় রীতিনীতি যে বৌদ্ধদের গ্রন্থ হইতে গৃহীত, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। নৈতিকতার উচ্চমান এবং পবিত্র জীবনের যে আদর্শ বুদ্ধের উপদেশ হইতে পাওয়া যায়, বক্তা কিছুক্ষণ তাহার বর্ণনা করেন; তবে তিনি বলেন যে, ব্যক্তি-ঈশ্বরে বিশ্বাস-সম্পর্কে বৌদ্ধধর্মে অজ্ঞেয়বাদই প্রবল। বুদ্ধের শিক্ষার প্রধান কথা হইল—‘সৎ হও, নীতিপরায়ণ হও, পূর্ণতা লাভ কর।’

৩৪. সুদূর ভারতবর্ষ হইতে

'স্যাগিন কুরিআর হেরাল্ড', ২২ মার্চ, ১৮৯৪

হিন্দু প্রচারক কানন্দের স্যাগিনে আগমন ও একাডেমীতে মনোজ্ঞ বাক্যালাপ।

গত সন্ধ্যায় হোটেল ভিন্‌সেণ্ট-এর লবিতে জনৈক বলিষ্ঠ সুঠাম ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। গায়ের শ্যামবর্ণের সহিত তাঁহার মুক্তা-ধবল দাঁত খুব উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। চওড়া এবং উঁচু কপালের নীচে তাঁহার চোখ দুটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিতেছিল। এই ভদ্রলোকই হইলেন হিন্দুধর্মের প্রচারক স্বামী বিবে কানন্দ। মিঃ কানন্দ শুদ্ধ এবং ব্যাকরণ-সম্মত ইংরেজীতে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। তাঁহার উচ্চারণে ঈষৎ বিদেশী ঢঙটি বেশ চিত্তরঞ্জক। ডেট্রয়েটের সংবাদপত্রসমূহ যাঁহারা পড়েন, তাঁহারা অবগত আছেন যে,মিঃ কানন্দ ঐ শহরে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ খ্রীষ্টানদের প্রতি তাঁহার কটাক্ষের জন্য তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন। মিঃ কানন্দের কাল একাডেমীতে বক্তৃতা দিতে যাইবার পূর্বে 'কুরিআর হেরাল্ড'-এর প্রতিনিধি তাঁহার সহিত কয়েক মিনিট কথোপকথনের সুযোগ পান। মিঃ কানন্দ বলেন, আজকাল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের পথ হইতে কিরূপ বিচ্যুতি ঘটিতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়াছেন; তবে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতরই ভালমন্দ দুই-ই আছে। মিঃ কানন্দের একটি উক্তি নিশ্চয়ই আমেরিকান আদর্শের বিরোধী। তিনি আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'না, আমি একজন প্রচারক মাত্র।' ইহা কৌতূহলের অভাব ও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক এবং ধর্মতত্ত্বাভিজ্ঞ এই বৌদ্ধ প্রচারকের সহিত যেন খাপ খায় না।

হোটেল হইতে একাডেমী খুব কাছেই। ৮টার সময় রোল্যাণ্ড কোনর তাঁহাকে নাতিবৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত পরিচিত করিয়া দেন। বক্তা একটি লম্বা আলখাল্লা পরিয়া গিয়াছিলেন

উহার কটিবন্ধটি লাল রঙের। তাঁহার মাথায় পাগড়ি ছিল, একটি অপ্রশস্ত শাল জড়াইয়া বোধ করি উহা গঠিত।

ভাষণের প্রারম্ভেই বক্তা বলিয়া লইলেন যে, তিনি মিশনরীরূপে এখানে আসেন নাই, বৌদ্ধরা (হিন্দুরা) অপর ধর্ম-বিশ্বাসের লোককে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করেন না। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় হইল—‘ধর্মসমূহের সমন্বয়’। মিঃ কানন্দ বলেন, প্রাচীনকালে এমন বহু ধর্ম ছিল—যাহাদের আজ আর কোন অস্তিত্ব নাই, ভারতবাসীর দুই-তৃতীয়াংশ হইল বৌদ্ধ (হিন্দু), অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ অন্যান্য নানা ধর্মের অনুগামী। বৌদ্ধমতে মৃত্যুর পর মানুষের নরকে শাস্তিভোগের কোন স্থান নাই। এখানে খ্রীষ্টানদের মত হইতে উহার পার্থক্য। খ্রীষ্টানরা ইহলোকে মানুষকে পাঁচ মিনিটের জন্য ক্ষমা করিতে পারে, কিন্তু পরলোকে তাহার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করে। মানুষের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা বুদ্ধই প্রথম দেন। বর্তমানকালে বৌদ্ধধর্মের ইহা একটি প্রধান নীতি। খ্রীষ্টানরা ইহা প্রচার করেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ অভ্যাস করেন না।

উদাহরণস্বরূপ তিনি এই দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোগণের অবস্থার বিষয় উল্লেখ করেন। তাহাদিগকে শ্বেতকায়গণের সহিত এক হোটেলে থাকিতে বা এক যানে চড়িতে দেওয়া হয় না। কোন ভদ্রলোক তাহাদিগের সহিত কথা বলে না। বক্তা বলেন, তিনি দক্ষিণে গিয়াছেন এবং নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ হইতে ইহা বলিতেছেন।

৩৫. আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত একটি সন্ধ্যা

‘নরদ্যাম্প্‌টন ডেলী হেরাল্ড’, ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৪

স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সমুদ্রের অপর পারে আমাদের যে-সব প্রতিবেশী আছেন—এমন কি যাঁহারা সুদূরতম অঞ্চলের বাসিন্দা, তাঁহারাও আমাদের নিকট সম্পর্কের আত্মীয়, শুধু বর্ণ ভাষা আচার-ব্যবহার ও ধর্মে সামান্য যা একটু পার্থক্য। এই বাগ্মী হিন্দু সন্ন্যাসী গত শনিবার সন্ধ্যায় সিটি হল-এ তাঁহার বক্তৃতার উপক্রমণিকাস্বরূপ ভারতীয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক চিত্র তুলিয়া ধরেন। উহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, অনেকে যথেষ্ট না জানিলেও বা অস্বীকার করিলেও জাতিসমূহের পারস্পরিক মিল ও সম্পর্ক একটি সুস্পষ্ট সত্য ঘটনা।

ইহার পর বক্তা মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল কথোপকথনচ্ছলে হিন্দু জনগণের কতিপয় আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের এই আলোচ্য বিষয়টিতে একটি স্বাভাবিক বা অনুশীলিত অনুরাগ আছে, তাঁহারা বক্তা ও তাঁহার চিন্তাধারার প্রতি নানা কারণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বক্তা অপরদের নৈরাশ্যই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার আলোচনার গণ্ডী আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। আমেরিকার বক্তৃতা-মঞ্চের পক্ষে বক্তৃতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদিগের ‘আচার-ব্যবহার’ সম্বন্ধে সামান্যই বলা হইয়াছিল। এই প্রাচীনতম জাতির এমন একজন সুযোগ্য প্রতিনিধির মুখ হইতে ঐ জাতির ব্যক্তিগত, নাগরিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্মসংক্রান্ত আরও অনেক কিছু তথ্য শুনিতে পাইলে সকলেই খুশী হইতেন। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা জিজ্ঞাসু, তাঁহাদিগের নিকট এই বিষয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক, যদিও এই দিকে তাঁহাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

হিন্দু-জীবনের প্রসঙ্গ বক্তা আরম্ভ করেন হিন্দু-বালকের জন্ম হইতে। তারপর বিদ্যারম্ভ ও বিবাহ। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের উল্লেখ সামান্য মাত্র করা হয়, যদিও লোকে আরও বেশী শুনিবার আশা করিয়াছিল। বক্তা ঘন ঘন সমাজ, নীতি ও ধর্মের দিক্ দিয়া ভারতীয় জাতির চিন্তা ও কার্যধারার সহিত ইংরেজীভাষী জাতিসমূহের ভাব ও আচরণের তুলনামূলক মন্তব্যে ব্যাপৃত হইতেছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভারতের

অনুকূলে উপস্থাপিত হইতেছিল, তবে তাঁহার প্রকাশভঙ্গী অতি বিনীত, সহৃদয় ও ভদ্র। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন, যাঁহারা হিন্দু জাতির সকল শ্রেণীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচিত। বক্তার আলোচিত অনেকগুলি বিষয়ে তাঁহাকে দু-একটি পাল্টা প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, বক্তা যখন চমৎকার বাগ্মিতার সহিত 'নারী জাতিকে দিব্য মাতৃত্বের দৃষ্টিতে দেখা' হিন্দুদের এই ভাবটি বর্ণনা করিতেছিলেন—বলিতেছিলেন, ভারতে নারী চিরদিন শ্রদ্ধার পাত্রী এবং এমন কি কখনও কখনও যে গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে তিনি পূজিত হন, তাহা স্ত্রীজাতির প্রতি অতিশয় সম্মানসম্পন্ন আমেরিকান পুত্র, স্বামী ও পিতারা কল্পনাও করিতে পারিবেন না—তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন যে, এই সুন্দর উচ্চ আদর্শটি কার্যতঃ হিন্দুদের গৃহে স্ত্রী, জননী, কন্যা এবং ভগিনীদের প্রতি কতদূর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

বক্তা শ্বেতকায় ইওরোপীয় ও আমেরিকান জাতিদের বিত্তলোভ, বিলাসব্যসন, স্বার্থপরতা এবং কাঞ্চন-কৌলীন্যের সমালোচনা করিয়া উহাদের বিষময় নৈতিক ও সামাজিক পরিণামের কথা বলেন। তাঁহার এই সমালোচনা সম্পূর্ণ ন্যায্য এবং তিনি উহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ধীর, মৃদু, শান্ত, অনুত্তেজিত ও মধুর কণ্ঠে বক্তা তাঁহার চিন্তাগুলিকে যে বাক্যের আকার দিতেছিলেন, উহাদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ভাষার শক্তি ও আগুন এবং উহা সোজাসুজি তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিতেছিল। য়াহুদীদের প্রতি যীশুখ্রীষ্টের উগ্র কটূক্তির কথা মনে হইতেছিল। কিন্তু অভিজাতকুলোদ্ভব, চরিত্র ও শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ঐ হিন্দু মহোদয় যখন মাঝে মাঝে কতকটা যেন তাঁহার নিজের অজ্ঞাতসারেই মূল বক্তব্য হইতে সরিয়া গিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, তাঁহার স্বজাতির ধর্ম যাহা স্পষ্টভাবে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী, প্রধানতঃ নিজেকে বাঁচাইতে ব্যস্ত, নেতিমূলক, নিশ্চেষ্ট ও কর্মবিমুখ—খ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত প্রাণবন্ত, উদ্যমশীল, আত্মত্যাগী, সর্বদা পরহিতব্রতী, পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারশীল, কর্মতৎপর ধর্ম হইতে পৃথিবীতে উপযোগিতার দিক্ দিয়া উৎকৃষ্ট, তখন মনে হয়, তাঁহার এই প্রচেষ্টা একটি বড় রকমের চাল। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী অবিবেচক গোঁড়ারা যতই শোচনীয় ও লজ্জাকর

ভুল করিয়া থাকুক না কেন, ইহা তো সত্য যে পৃথিবীতে যত নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং লোকহিতকর কাজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নয়-দশমাংশ এই ধর্মের নামেই সম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু স্বামী বিবে কানন্দকে দেখা ও তাঁহার কথা শুনিবার সুযোগ—কোন বুদ্ধিমান্ ও পক্ষপাতশূন্য আমেরিকানেরই ত্যাগ করা উচিত নয়। যে জাতি উহার আয়ুষ্কাল আমাদের ন্যায় শতাব্দীতে মাপ না করিয়া হাজার হাজার বৎসর দিয়া গণনা করে, সেই জাতির মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন হইলেন স্বামী বিবে কানন্দ। তাঁহার সহিত পরিচয় প্রত্যেকেরই পক্ষে প্রচুর লাভজনক। রবিবার অপরাহ্ণে এই বিশিষ্ট হিন্দু স্মিথ-কলেজের ছাত্রদের নিকট 'ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে এই ভাষণ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। বক্তার সমগ্র চিন্তাধারায় উদারতম বদান্যতা এবং যথার্থ ধর্মপ্রাণতা যে পরিস্ফুট, ইহা প্রত্যেকেই বলিতেছিলেন।

'স্মিথ কলেজ মাসিক', মে, ১৮৯৪

১৫ এপ্রিল রবিবার হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁহার ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যান চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রভূত প্রশংসাসূচক মন্তব্যের সৃষ্টি করিয়াছিল—কলেজের সান্ধ্য উপাসনায় বক্তৃতা দেন। আমরা মানুষের সৌভ্রাত্র এবং ঈশ্বরের পিতৃভাব সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়া থাকি, কিন্তু এই শব্দগুলির প্রকৃত তাৎপর্য অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করে। মানবাত্মা যখন বিশ্বপিতার এত সন্নিকটে আসে যে, দ্বেষ হিংসা এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষুদ্র দাবীসমূহ তিরোহিত হয় (কেননা মানুষের স্বরূপ—এগুলির অনেক ঊর্ধ্বে), তখনই যথার্থ বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর। আমাদের সতর্ক থাকা উচিত—আমরা যেন হিন্দুদের গল্পে বর্ণিত 'কূপমণ্ডূক' না হইয়া পড়ি। একটি ব্যাঙ বহু বৎসর ধরিয়া একটি কূপের মধ্যে বাস করিতেছিল। অবশেষে কূপের বাহিরে যে খোলা জায়গা আছে, তাহা সে ভুলিয়া গেল এবং উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে লাগিল।

৩৬. ভারত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে

‘নিউ ইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউন’, ২৫ এপ্রিল, ১৮৯৪

গত সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ালডর্ফ হোটেলে মিসেস আর্থার স্মিথের ‘কথোপকথন-চক্রের’র নিকট ‘ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম’ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গায়িকা মিসেস সারা হামবার্ট ও মিস অ্যানি উইলসন অনেকগুলি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বক্তা একটি কমলালেবু রঙের কোট এবং হলদে-পাগড়ি পরিয়াছিলেন। ইহা হইল ভগবান্ এবং মানব-সেবার জন্য সর্বত্যাগী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশ।

বক্তা পুনর্জন্মবাদের আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা কলহপ্রিয়তাই বেশী, এমন অনেক ধর্মযাজক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পূর্বজন্ম যদি থাকে তাহা হইলে লোকের উহা স্মরণ হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, স্মরণ করিতে পারা না পারার উপর কোন ঘটনার সত্যাসত্য স্থাপন করা ছেলেমানুষি! মানুষ তো তাহার জন্মের কথা মনে করিতে পারে না এবং জীবনে ঘটিয়াছে, এমন আরও অনেক কিছুই তো সে ভুলিয়া যায়।

বক্তা বলেন, খ্রীষ্টধর্মের ‘শেষ বিচারের দিন’-এর ন্যায় কোন বস্তু হিন্দুধর্মে নাই। হিন্দুদের ঈশ্বর শাস্তি দেন না, পুরস্কৃতও করেন না। কোন প্রকার অন্যায় করিলে তাহার শাস্তি অবিলম্বে স্বাভাবিকভাবেই ঘটিবে। যতদিন না পূর্ণতা লাভ হইতেছে, ততদিন আত্মাকে এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।

৩৭. ভারতীয় আচার-ব্যবহার

‘বষ্টন হেরাল্ড’, ১৫ মে, ১৮৯৪

গতকল্য ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 'ভারতীয় ধর্ম' (বস্তুতঃ—ভারতীয় আচার-ব্যবহার) সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিবার জন্য এসোসিয়েশন হল-এ মহিলাদের খুব ভিড় হয়। ১৬নং ওয়ার্ডের ডে নার্সারী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে এই বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। (বস্তুতঃ টাইলার স্ট্রীট ডে নার্সারী বিদ্যালয়।) এই ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী গত বৎসর চিকাগোতে যেমন সকলের মনোযোগ ও উৎসাহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবার বষ্টনে অনুরূপ ঘটিয়াছে। তাঁহার আন্তরিক সাধু মার্জিত চালচলন দ্বারা তিনি বহু অনুরাগী বন্ধু লাভ করিয়াছেন।

বক্তা বলেনঃ হিন্দুজাতির ভিতরে বিবাহকে খুব বড় করিয়া দেখা হয় না। কারণ ইহা নয় যে, আমরা স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করি। আমাদের ধর্ম নারীকে মাতৃবুদ্ধিতে পূজা করিবার উপদেশ দেয় বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। প্রত্যেক নারী হইলেন নিজের মায়ের মত—এই শিক্ষা হিন্দুরা বাল্যকাল হইতে পায়। কেহ তো আর জননীকে বিবাহ করিতে চায় না। আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া ভাবি। স্বর্গবাসী ঈশ্বরের আমরা আদৌ পরোয়া করি না। বিবাহকে আমরা একটি নিম্নতর অবস্থা বলিয়া মনে করি। যদি কেহ বিবাহ করে, তবে ধর্মপথে তাহার একজন সহায়ক সঙ্গীর প্রয়োজন বলিয়াই করে।

তোমরা বলিয়া থাক যে, আমরা হিন্দুরা আমাদের নারীদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করি। পৃথিবীর কোন্ জাতি স্ত্রীজাতিকে পীড়া দেয় নাই? ইওরোপ বা আমেরিকায় কোন ব্যক্তি অর্থের লোভে কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করিতে পারে এবং বিবাহের পর তাঁহার অর্থ আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে ভারতে কোন স্ত্রীলোক যদি ধনলোভে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তানদের ক্রীতদাস বলিয়া মনে করা হয়। বিত্তবান্ পুরুষ বিবাহ করিলে তাঁহার অর্থ তাঁহার পত্নীর হাতেই যায় এবং সেইজন্য টাকাকড়ির ভার যিনি লইয়াছেন, সেই পত্নীকে পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

তোমরা আমাদিগকে পৌত্তলিক, অশিক্ষিত, অসভ্য প্রভৃতি বলিয়া থাক, আমরা শুনিয়া এইরূপ কটুভাষী তোমাদের ভদ্রতার অভাব দেখিয়া মনে মনে হাসি। আমাদের দৃষ্টিতে

সদ্‌গুণ এবং সৎকুলে জন্মই জাতি নির্ধারণ করে, টাকা নয়। ভারতে টাকা দিয়া সম্মান কেনা যায় না। জাতিপ্রথায় উচ্চতা অর্থ দ্বারা নিরূপিত হয় না। জাতির দিক্‌ দিয়া অতি দরিদ্র এবং অত্যন্ত ধনীর একই মর্যাদা। জাতিপ্রথার ইহা একটি চমৎকার দিক্‌।

বিত্তের জন্য পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে, খ্রীষ্টানরা পরস্পর পরস্পরকে মাটিতে ফেলিয়া পদদলিত করিয়াছে। ধনলিপ্সা হইতেই জন্মায় হিংসা, ঘৃণা, লোভ এবং চলে প্রচণ্ড কর্মোন্মত্ততা, ছুটাছুটি, কলরব। জাতিপ্রথা মানুষকে এই-সকল হইতে নিষ্কৃতি দেয়। উহা তাহাকে অল্প টাকায় জীবনযাপন করিতে সক্ষম করে এবং সকলকেই কাজ দেয়। জাতিপ্রথায় মানুষ আত্মার চিন্তা করিবার অবসর পায়, আর ভারতীয় সমাজে ইহাই তো আমরা চাই।

ব্রাহ্মণের জন্ম দেবার্চনার জন্য। জাতি যত উচ্চ, সামাজিক বিধি-নিষেধও তত বেশী। জাতিপ্রথা আমাদিগকে হিন্দুজাতিরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রথার অনেক ত্রুটি থাকিলেও বহু সুবিধা আছে।

মিঃ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষ করিয়া বারাণসীর (?) প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়টির উল্লেখ করেন। উহার ছাত্র ও অধ্যাপকদের মোট সংখ্যা ছিল ২০, ০০০।

বক্তা আরও বলেন, 'তোমরা যখন আমার ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে বস, তখন ধরিয়া লও যে, তোমাদের ধর্মটি হইল নিখুঁত আর আমারটি ভুল। ভারতের সমাজের সমালোচনা করিবার সময়েও তোমরা মনে কর, যে পরিমাণে উহা তোমাদের আদর্শের সঙ্গে মিলে না, সেই পরিমাণে উহা অমার্জিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী অর্থহীন।'

শিক্ষা সম্পর্কে বক্তা বলেন, ভারতে যাহারা অধিক শিক্ষিত, তাহারা অধ্যাপনার কাজ করে। অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতেরা পুরোহিত হয়।

৩৮. ভারতের ধর্মসমূহ

‘বষ্টন হেরাল্ড’, ১৭ মে, ১৮৯৪

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ গতকল্য বিকালে এসোসিয়েশন হল-এ ১৬নং ওয়ার্ড ডে নার্সারী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ‘ভারতের ধর্মসমূহ’ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্রচুর শ্রোতৃসমাগম হইয়াছিল।

বক্তা প্রথমে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলেন। ভারতের জনসংখ্যার এক পঞ্চামাংশ হইল মুসলমান। ইঁহারা বাইবেলের পুরাতন এবং নূতন দুই টেষ্টামেণ্টেই বিশ্বাস করেন, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টকে শুধু ভগবদাদিষ্ট মহাপুরুষ মাত্র বলেন। খ্রীষ্টানদের ন্যায় ইঁহাদের উপাসনাসমূহের কোন সংস্থা নাই, তবে সম্মিলিত কোরানপাঠ প্রচলিত।

ভারতবর্ষের আর একটি ধর্মসম্প্রদায় পার্শী জাতি। ইঁহাদের ধর্মগ্রন্থের নাম জেন্দ্-আবেস্তা। ইঁহারা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতায় বিশ্বাসী—কল্যাণের অধিষ্ঠাতা আরমুজ্দ্ এবং অশুভের জনক আহ্রিমান। পার্শীদের নৈতিক-বিধানের সারমর্ম হইলঃ সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য এবং সৎ কর্ম।

হিন্দুগণ বেদকে তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকীয় জাতির রীতিনীতি মানিতে বাধ্য, তবে ধর্মের ব্যাপারে নিজের খুশীমত চিন্তা করিয়া দেখিবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেককে দেওয়া হয়। ধর্মসাধনার একটি অংশ হইল কোন সাধুপুরুষ বা ধর্মাচার্যকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাঁহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহ ক্রিয়া করিতেছে, উহার সুযোগ লওয়া।

হিন্দুদের তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায় রহিয়াছে—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদী। এগুলিকে কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পথে স্বভাবিকভাবে উপস্থিত তিনটি ধাপ বলিয়া মনে করা হয়।

তিন সম্প্রদায়ই ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তবে দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর এবং মানুষ পরস্পর ভিন্ন। পক্ষান্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র সত্তা আছে—ইহা ঈশ্বর ও জীব দুয়েরই অতীত।

বক্তা বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুধর্মের প্রকৃতি কি, তাহা দেখান এবং বলেন, ভগবানকে পাইতে হইলে আমাদিকে নিজেদের হৃদয় অন্বেষণ করিতে হইবে। পুঁথিপত্রের মধ্যে ধর্ম নাই। ধর্ম হইল অন্তরের অন্তরে তাকাইয়া ঈশ্বর ও অমৃতত্বের সত্যকে উপলব্ধি করা। বেদের একটি উক্তিঃ ‘যাহাকে আমি পছন্দ করি, তাহাকে সত্যদ্রষ্টারূপে গড়িয়া তুলি।’ সত্যদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই ধর্মের মূল লক্ষ্য।

জৈনধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বক্তা তাঁহার আলোচনার উপসংহার করেন। এই ধর্মাবলম্বীরা মূক প্রাণীদের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করে। তাঁহাদের নৈতিক অনুশাসন হইল সংক্ষেপেঃ কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করাই মহত্তম কল্যাণ।

৩৯. ভারতের ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাস

‘হার্ভার্ড ক্রিমজন’, ১৭ মে, ১৮৯৪

হার্ভার্ড ধর্ম-সম্মিলনীর উদ্যোগে গতকল্য সন্ধ্যায় ‘সেভার হল’-এ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। বক্তার পরিষ্কার ওজস্বী কণ্ঠ এবং ধীর আন্তরিকতাপূর্ণ বাচনভঙ্গীর জন্য তাঁহার কথাগুলি বিশেষভাবে হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ বলেন, ভারতে নানা ধর্মসম্প্রদায় এবং ধর্মমত বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি-ঈশ্বর স্বীকার করে, অপর কতকগুলির মতে ভগবান্ এবং বিশ্বজগৎ অভিন্ন। তবে যে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন, কোন হিন্দু বলে না যে,

তাহার মতটিই সত্য আর অপরে ভ্রান্ত। হিন্দু বিশ্বাস করে যে, ভগবানের নিকট পৌঁছিবার পথ বহু; যিনি প্রকৃত ধার্মিক, তিনি দল বা মতের ক্ষুদ্র কলহের ঊর্ধ্বে। যদি কাহারও যথার্থ ধারণা হয় যে, সে দেহ নয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, তবেই তাহাকে ভারতে ধার্মিক বলা হয়, তার পূর্বে নয়।

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী হইতে গেলে দেহের চিন্তা সর্বতোভাবে বিস্মৃত হওয়া এবং অন্য মানুষকে আত্মা বলিয়া ভাবা প্রয়োজনীয়। এইজন্য সন্ন্যাসীরা কখনও বিবাহ করে না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় দুইটি ব্রত লইতে হয়—দারিদ্র্য এবং ব্রহ্মচর্য। সন্ন্যাসীর টাকাকড়ি লওয়া বা থাকা নিষিদ্ধ। সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিবার সময় প্রথম একটি ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়—নিজের প্রতিমূর্তি দগ্ধ করা। ইহার দ্বারা পুরাতন শরীর নাম ও জাতি যেন চিরকালের জন্য ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। তারপর ব্রতীকে একটি নূতন নাম দেওয়া হয় এবং তিনি স্বেচ্ছামত পর্যটন বা ধর্মপ্রচারের অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু তিনি যে শিক্ষা দেন, তাহার জন্য প্রতিদানে তাঁহার কোন অর্থ লইবার অধিকার নাই।

৪০. উপদেশ কম, খাদ্য বেশী

‘বাল্টিমোর আমেরিকান’, ১৫ অক্টোবর, ১৮৯৪

ভ্রম্যান ব্রাদার্স-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় আলোচনা-সভাগুলির প্রথমটি গতকল্য রাত্রিতে লাইসিয়াম থিয়েটারে সম্পন্ন হয়। খুব ভিড় হইয়াছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল ‘প্রাণবন্ত ধর্ম।’

ভারত হইতে আগত ধর্মযাজক স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শেষ বক্তা। যদিও তিনি অল্পক্ষণ বলিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষা এবং বক্তৃতার ধরন অতি সুন্দর। তাঁহার উচ্চারণে বৈদেশিক ধাঁচ থাকিলেও তাঁহার কথা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। তিনি তাঁহার স্বদেশীয় পোষাক পরিয়াছিলেন, উহা বেশ জমকালো। তিনি বলেন, তাঁহার পূর্বে অনেক ওজস্বী ভাষণ হইয়া

যাওয়াতে তিনি সংক্ষেপেই তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে চান। পূর্ব-বক্তারা যাহা বলিয়াছেন, তিনি তাহা অনুমোদন করিতেছেন। তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন এবং নানাশ্রেণীর লোকের কাছে ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা এই যে, কি মতবাদ প্রচার করা হইল, তাহাতে অল্পই আসে যায়। আসল প্রয়োজন হইল একটি কার্যকর কর্মপন্থা। বড় বড় কথা যদি কাজে পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস চলিয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্র লোকের ব্যাকুল চাহিদা হইল—উপদেশ কম, খাদ্য বেশী। ভারতবর্ষে মিশনরী পাঠান ভালই, তাঁহার ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই, তবে তাঁহার মতে লোক কম পাঠাইয়া বেশী টাকা পাঠান সঙ্গত। ভারতে ধর্মমতের অভাব নাই। নূতন ধর্মমত আমদানী করা অপেক্ষা ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপনই অধিক প্রয়োজনীয়। ভারতবাসী এবং পৃথিবীর সর্বত্র অন্যান্য সকলেই উপাসনার রীতি সম্বন্ধে শিক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু মুখে প্রার্থনা উচ্চারণ করা যথেষ্ট নয়। হৃদয়ের আন্তরিকতা দিয়া প্রার্থনা করা চাই। বক্তা বলেন, 'বাস্তবপক্ষে জগতে প্রকৃত কল্যাণচিকীর্ষুর সংখ্যা খুব অল্প। অপরে শুধু তাকাইয়া দেখে, বাহবা দেয় এবং ভাবে যে, তাহারা নিজেরা অনেক কিছু মহৎ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রেমই যথার্থ জীবন। মানুষ যখন অপরের হিত করিতে ক্ষান্ত হয়, তখন আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া সে মৃত।'

আগামী রবিবার সন্ধ্যায় লাইসিয়ামে স্বামী বিবেকানন্দ হইবেন প্রধান বক্তা।

৪১. বুদ্ধের ধর্ম

'মর্নিং হেরাল্ড', ২২ অক্টোবর, ১৮৯৪

গত রাত্রে ব্রুম্যান ভ্রাতৃমণ্ডলী কর্তৃক আয়োজিত 'প্রাণবন্ত ধর্ম' পর্যায়ের দ্বিতীয় বক্তৃতায় লাইসিয়াম থিয়েটার লোকের ভিড়ে পুরাপুরি ভরিয়া গিয়াছিল। শ্রোতাদের সংখ্যা তিন হাজার হইবে ... বক্তৃতা করেন রেভারেণ্ড হিরাম ব্রুম্যান, রেভারেণ্ড ওয়াল্টার ব্রুম্যান এবং এই শহরে (বাল্টিমোর) সম্প্রতি আগত ব্রাহ্মণ ধর্মযাজক রেভারেণ্ড স্বামী

বিবেকানন্দ। বক্তারা সকলেই ষ্টেজের উপর বসিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড বিবেকানন্দ সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিলেন।

তিনি একটি হলুদ রঙের পাগড়ি এবং লাল রঙের আলখাল্লা পরিয়াছিলেন। আলখাল্লার কটিবন্ধটিও লাল রঙের। এই পোষাক তাঁহার প্রাচ্য চেহারার মর্যাদা বাড়াইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি একটি অদ্ভুত আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বই গতরাত্রের অনুষ্ঠানটিকে যেন জমাইয়া রাখিয়াছিল। সহজভাবে একটুও বিব্রত বোধ না করিয়া তিনি ভাষণটি বলিয়া গেলেন। উহার ভাষা নিখুঁত, উচ্চারণ—ইংরেজী ভাষা-জানা কোন সুশিক্ষিত ল্যাটিন-জাতীয় ব্যক্তির ন্যায়। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ দেওয়া হইতেছেঃ

খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বৎসর আগে বুদ্ধ তাঁহার ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তিনি দেখিলেন, ভারতবর্ষে তখন ধর্ম প্রধানতঃ মানুষের আত্মার প্রকৃতি লইয়া অন্তহীন বাদ-বিতণ্ডায় ব্যাপৃত। ধর্মজীবনের প্রত্যবায়সমূহের অপনোদনের জন্য তদানীন্তন ধর্মের শিক্ষায় প্রাণিহত্যা যাগযজ্ঞ এবং অনুরূপ প্রণালীগুলির উপরই নির্ভর করা হইত।

বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি এইরূপ ধর্মব্যবস্থার মধ্যে একটি অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম কথা এই যে, তিনি কোন নূতন ধর্ম প্রচলিত করেন নাই, তাঁহার আন্দোলন ছিল সংস্কারমূলক। সকলের হিত-কামনা ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম তিনটি আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত। প্রথম—অশুভ আছে। দ্বিতীয়—এই অশুভের কারণ কি? বুদ্ধ বলিলেন, অশুভের কারণ মানুষের অপরের উপর প্রাধান্য-লাভের কামনা। তৃতীয়—নিঃস্বার্থপরতা দ্বারা এই দোষ দূর করা যাইতে পারে। বুদ্ধের মতে—বল প্রকাশ করিয়া ইহার প্রতিরোধ সম্ভবপর নয়। ময়লা দিয়া ময়লা ধোয়া যায় না; ঘৃণার দ্বারা ঘৃণা নিবারিত হয় না।

ইহাই হইল বুদ্ধের ধর্মের ভিত্তি। যতক্ষণ সমাজ মানুষের স্বার্থপরতা এমন সব আইন-কানুন ও সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করে, যেগুলির লক্ষ্য হইল জোর করিয়া মানুষকে প্রতিবেশীদের হিতসাধনে প্রযোজিত করা, ততক্ষণ কোন সুফল হইবার

নয়। কৌশলের বিরুদ্ধে কৌশলকে, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসাকে না লাগানই হইল কার্যকর পন্থা। নিঃস্বার্থ নরনারী সৃষ্টি করাই হইল একমাত্র প্রতীকার। বর্তমানের অশুভগুলি দূর করিবার জন্য আইন চালু করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাতে বিশেষ কোন ফল হইবে না।

বুদ্ধ দেখিয়াছিলেন, ভারতে ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বরূপ লইয়া অত্যধিক জল্পনা চলে, কিন্তু প্রকৃত কাজ হয় অতি সামান্য। এই মুখ্য সত্যটির উপর তিনি সর্বদা জোর দিতেনঃ আমাদিগকে সৎ এবং পবিত্র হইতে হইবে এবং অপরকে পবিত্র হইবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মানুষকে উদ্যমশীল হইয়া অপরের উপকার সাধনে লাগিতে হইবে, অন্যের মধ্যে নিজের আত্মাকে, অন্যের ভিতর নিজের জীবনকে খুঁজিয়া পাইতে হইবে। অপরের কল্যাণ-সাধনের দ্বারাই আমরা নিজেদের মঙ্গল বিধান করি। বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন, জগতে সর্বদাই অত্যধিক পরিমাণে মতবাদ চলিতে থাকে, তদনুপাতে কার্যতঃ অভ্যাস দেখা যায় খুব কম। বর্তমানকালে বুদ্ধের মত ১২ জন লোক যদি ভারতে থাকেন তো ঐ দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত। এই দেশে একজন বুদ্ধ পাওয়া গেলে প্রভূত কল্যাণ হইবে।

ধর্মীয় মতবাদ যখন বৃদ্ধি পায়, পিতৃপুরুষের ধর্মে অন্ধবিশ্বাস যখন প্রবল হয় এবং কুসংস্কারকে যখন যুক্তি দ্বারা সমর্থনের চেষ্টা চলে, তখন একটি পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কেননা ঐ-সকলের দ্বারা মানুষের অনিষ্টই বাড়িতে থাকে, উহাদের শোষণ না হইলে মানুষের কল্যাণ নাই।

মিঃ বিবেকানন্দের বক্তৃতার শেষে শ্রোতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

‘বাল্টিমোর আমেরিকান’, ২২ অক্টোবর, ১৮৯৪

‘প্রাণবন্ত ধর্ম’ সম্বন্ধে ভ্রূম্যান ভ্রাতৃমণ্ডলী যে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয়টি শুনিবার জন্য গত রাত্রে লাইসিয়াম থিয়েটার গৃহ লোকে সম্পূর্ণ ভরিয়া গিয়াছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলেন

এবং বুদ্ধের জন্মের সময় ভারতবাসীর মধ্যে যে-সব দোষ ছিল, তাহার উল্লেখ করেন। ঐসময়ে ভারতে সামাজিক অসাম্য পৃথিবীর অন্য যে-কোন অঞ্চল অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারতীয় জনগণের মনে পুরোহিত সম্প্রদায়ের খুব প্রভাব ছিল। বুদ্ধি-বিচার এবং বিদ্যাবত্তা—পেষণযন্ত্রের এই দুই পাথরের মধ্যে পড়িয়া জনসাধারণ নিষ্পিষ্ট হইতেছিল।

বৌদ্ধধর্ম একটি নূতন ধর্মরূপে স্থাপিত হয় নাই; বরং উহার উৎপত্তি হইয়াছিল সেই সময়কার ধর্মের অবনতির সংশোধকরূপে। বুদ্ধই বোধ করি একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি নিজের দিকে বিন্দুমাত্র না তাকাইয়া সকল উদ্যম পরহিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মানুষের দুঃখকষ্ট-রূপ ভীষণ ব্যাধির ঔষধ অন্বেষণের জন্য তিনি গৃহ এবং জীবনের সকল ভোগসুখ বিসর্জন দিয়াছিলেন। যে যুগে পণ্ডিত এবং পুরোহিতকুল ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথা তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত, বুদ্ধ সেই সময়ে মানুষ যাহা খেয়াল করে না, জীবনের সেই একটি বিপুল বাস্তব সত্য আবিষ্কার করিলেন—দুঃখের অস্তিত্ব। আমরা অপরকে ডিঙাইয়া যাইতে চাই এবং আমরা স্বার্থপর বলিয়াই পৃথিবীতে এত অনিষ্ট ঘটে। যে মুহূর্তে জগতের সকলে নিঃস্বার্থ হইতে পারিবে, সেই মুহূর্তে সকল অশুভ তিরোহিত হইবে। সমাজ যতদিন আইন-কানুন এবং সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অকল্যাণের প্রতীকার করিতে সচেষ্ট, ততদিন ঐ প্রতিকার অসম্ভব। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জগৎ ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছে; কোন ফল হয় নাই। হিংসা দ্বারা হিংসা জয় করা যায় না। নিঃস্বার্থপরতা দ্বারাই সকল অশুভ নিবারিত হয়। নূতন নূতন নিয়ম না করিয়া মানুষকে পুরাতন নিয়মগুলি পালন করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তবে অপর কোন ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শিক্ষা। সাম্প্রদায়িকতা মানবগোষ্ঠীর ভিতর পারস্পরিক সংঘর্ষ আনিয়া কল্যাণশক্তি হারাইয়া ফেলে।

৪২. সকল ধর্মই ভাল

‘ওয়াশিংটন পোষ্ট’, ২৯ অক্টোবর, ১৮৯৪

‘পীপ্‌ল্‌স্‌ চার্চ’ গীর্জার ধর্মযাজক ডক্টর কেণ্ট-এর আমন্ত্রণে মিঃ কানন্দ গতকল্য সেখানে বক্তৃতা করেন। সকালের বক্তৃতাটি ছিল রীতিমত ধর্মোপদেশ। ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক্‌ মাত্রই তিনি আলোচনা করেন। প্রাচীনপন্থী সম্প্রদায়গুলির নিকট তাঁহার কথা কিছু অভিনব মনে হইবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক ধর্মের মূলেই ভাল জিনিষ আছে। ভাষাসমূহের ন্যায় বিভিন্ন ধর্মও একটি সাধারণ আকর হইতে উৎপন্ন। গোঁড়া মতবাদ এবং প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণতি—এই দুইটি হইতে যদি ধর্মকে মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্মই মানুষের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারে। বিকালের আলোচনাটি ছিল আর্যজাতি সম্বন্ধে। উহা প্রায় একটি বক্তৃতার আকারেই উপস্থাপিত হয়। বক্তা বিভিন্ন জাতির ভাষা, ধর্ম এবং রীতিনীতি বিশ্লেষণ করিয়া একটি সাধারণ সংস্কৃতভাষাগোষ্ঠী হইতে উহাদের সকলের উৎপত্তি প্রমাণ করেন।

সভার পর মিঃ কানন্দ ‘পোষ্ট’-এর জনৈক সংবাদদাতাকে বলেন, আমি কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করি না। আমার ভূমিকা একজন পরিদর্শকের এবং যতদূর পারি, আমি মানুষকে শিক্ষা দিবার কার্যে ব্রতী। আমার কাছে সব ধর্মই সুন্দর। জীবন ও জগতের উচ্চতর রহস্য সম্বন্ধে অন্যের মত আমিও কতকগুলি ধারণা উপস্থাপিত করার বেশী আর কিছু করিতে পারি না। আমার মনে হয়, পুনর্জন্মবাদ ধর্মবিষয়ে আমাদের অনেক জিজ্ঞাসার একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার খুব কাছাকাছি যায়। কিন্তু ইহাকে আমি একটি ধর্মতত্ত্ব বলিয়া খাড়া করিতে চাই না। বড়জোড় ইহা একটি মতবাদ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া ইহা প্রমাণ করা যায় না। যাঁহার ঐ অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাঁহারই পক্ষে ঐ প্রমাণ কার্যকর। তোমার অভিজ্ঞতা আমার কাছে কিছুই নয়, আমার অভিজ্ঞতাও তোমর নিকট নিস্ফল। আমি অলৌলিক ঘটনায় বিশ্বাসী নই। ধর্মের ব্যাপারে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা আমার নিকট অপ্রীতিকর।

৪৩. তিনি ইহা অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন

তবে আমার বর্তমান অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য আমাকে একটি অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থায় অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে। আর আমরা যদি এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাই, আমাদিগকে নিশ্চয়ই অন্য কোন আকার ধারণ করিতে হইবে। এই দিক্ দিয়া আমার পুনর্জন্মে বিশ্বাস আসে। তবে আমি ইহা হাতে-নাতে প্রমাণ করিতে পারি না। পুনর্জন্মবাদের বদলে অন্য সুষ্ঠুতর কিছু যদি কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি এই মত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। এ পর্যন্ত আমি নিজে ঐরূপ সন্তোষজনক কিছু খুঁজিয়া পাই নাই।

মিঃ কানন্দ কলিকাতার অধিবাসী এবং ওখানকার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। ইংরেজী যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের মতই তিনি ইংরেজী বলিতে পারেন। ঐ ভাষার মাধ্যমেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তিনি ইংরেজ জাতির সহিত ভারতবাসীর সংস্পর্শ লক্ষ্য করিবার প্রচুর সুযোগ পাইয়াছিলেন। কোন বৈদেশিক মিশনরী কর্মী কানন্দের কথাবার্তা শুনিলে ভারতবাসীকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী করা বিষয়ে নৈরাশ্য পোষণ করিবেন। এই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, পাশ্চাত্যের ধর্মশিক্ষা প্রাচ্যের চিন্তাধারার উপর কতদূর কার্যকরী হইয়াছে। কানন্দ উত্তরে বলেন, 'একটি দেশে নূতন কোন চিন্তাধারা গেলে উহার কিছু না কিছু ফল অবশ্যই ঘটে, তবে প্রাচ্য চিন্তাধারার উপর খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা যে-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা এতই সামান্য যে, উহা নজরেই আসে না।' প্রাচ্য চিন্তাধারা এ দেশে যেমন স্বল্পই দাগ রাখে, পাশ্চাত্য মতবাদসমূহেরও প্রাচ্যে ঐরূপ ফল, বরং অতটাও নয়। অর্থাৎ দেশের চিন্তাশীল লোকের উপর উহার কোনই প্রভাব নাই। সাধারণ লোকের ভিতর মিশনরীদের কাজের ফলও অতি সামান্য। যতগুলি ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, দেশীয় ধর্মসম্প্রদায় হইতে ততগুলি লোক অবশ্যই কমিয়া যায়, তবে দেশের সমগ্র জনসংখ্যা এত বিপুল যে, মিশনরীদের এই ধর্মান্তরীকরণের পরিমাপ নজরে আসে না।

৪৪. যোগীরা জাদুকর

যোগিগণ বা অপর পারদর্শিগণের অনুষ্ঠিত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা ও লামাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও তাঁহার মত অনুরূপ। মিঃ কানন্দ বলেন যে, অলৌকিক ঘটনায় তাঁহার কোন ঝোঁক নাই। দেশে অবশ্য বহু জাদুকর দেখা যায়, তবে উহারা যাহা দেখায় তাহা হাতের কৌশল বিশেষ। মিঃ কানন্দ নিজে একবার অল্প মাত্রায় একটি মুসলমান ফকিরের নিকট 'আমের ম্যাজিক' দেখিয়াছেন। লামাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও তাঁহার মত অনুরূপ। মিঃ কানন্দ বলেন, 'এইসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন বা পক্ষপাতশূন্য লোকের একান্তই অভাব, অতএব তাহাদের দেওয়া বিবরণের কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা বিচার করা কঠিন।'

৪৫. হিন্দু জীবন-দর্শন

'ব্রুকলিন টাইমস্‌', ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৯৪

গত রাত্রে পোচ গ্যালারীতে ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশন কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দকে একটি অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। ... অভ্যর্থনার পূর্বে এই বিশিষ্ট অতিথি 'ভারতের ধর্মসমূহ' সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা ছাড়া তিনি বলেন, 'আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি শিখিতে'—ইহাই হইল হিন্দুদের জীবনদর্শন। জ্ঞান সঞ্চয়েই জীবনের পূর্ণ সুখ। মানবাত্মা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-লাভের জন্যই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তোমার বাইবেলের সহিত পরিচয় থাকিলে আমি আমার শাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। সেইরূপ তুমিও তোমার বাইবেল সুষ্ঠুতরভাবে পড়িতে পারিবে, যদি আমার শাস্ত্রের সহিত তোমার পরিচয় থাকে। একটি ধর্ম সত্য হইলে অন্যান্য ধর্মও

নিশ্চয়ই সত্য। একই সত্য বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আর এই আকারগুলি নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বৈচিত্র্যের উপর।

আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা যদি জড়বস্তু বা তাহার পরিণাম দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলিত, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু চিন্তাশক্তি যে জড়বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করা যায় না। মানুষের দেহ কতকগুলি প্রবৃত্তি বংশানুক্রমে লাভ করে–তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই প্রবৃত্তিগুলির অর্থ হইল সেই উপযুক্ত শারীরিক সংহতি, যাহার মাধ্যমে একটি বিশেষ মন নিজস্ব ধারায় কাজ করিবে। জীবাত্মা যে বিশেষ মানসিক সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহা তাহার অতীত কর্ম দ্বারা সঞ্জাত। তাহাকে এমন একটি শরীর বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা তাহার মানসিক সংস্কারগুলির বিকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হয়। সাদৃশ্যের নিয়মে ইহা ঘটে। বিজ্ঞানের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, কেননা বিজ্ঞান 'অভ্যাস' দ্বারা সব কিছুর ব্যাখ্যা করিতে চায়। অভ্যাস সৃষ্ট হয় কোন কিছুর পুনঃপুনঃ ঘটনের ফলে। অতএব নবজাত আত্মার চারিত্রিক সংস্কারগুলি ব্যাখ্যা করিতে হইলে পূর্বে উহাদের পুনঃ- পুনঃ আবৃত্তি স্বীকার করা প্রয়োজন। ঐ সংস্কারগুলি তো এই জন্মে উৎপন্ন নয়, অতএব নিশ্চয়ই অতীত জন্ম হইতে উহারা আসিয়াছে।

মানবজাতির বিভিন্ন ধর্মগুলি বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মানবাত্মা যে-সব ধাপ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, প্রত্যেকটি ধর্ম যেন এক একটি ধাপ। কোন ধাপকেই অবহেলা করা উচিত নয়। কোনটিই খারাপ বা বিপজ্জনক নয়। সবগুলিই কল্যাণপ্রসূ। শিশু যেমন যুবক হয়, যুবক আবার যেমন পরিণত বয়স্কে রূপান্তরিত হয়, মানুষও সেইরূপ একটি সত্য হইতে অপর সত্যে উপনীত হয়। বিপদ আসে তখনই যখন এই বিভিন্ন অবস্থার সত্যগুলি অনমনীয় হইয়া দাঁড়ায় এবং আর নড়িতে চায় না। তখন মানুষের আধ্যাত্মিক গতি রুদ্ধ হয়। শিশু যদি না বাড়ে তো বুঝিতে হইবে সে ব্যাধিগ্রস্ত। মানুষ ধর্মের পথে যদি ধীরভাবে ধাপে ধাপে আগাইয়া চলে, তাহা হইলে এই ধাপগুলি ক্রমশঃ তাহাকে পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি আনিয়া দিবে। এইজন্য আমরা ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবই

বিশ্বাস করি, আর ঐ সঙ্গে অতীত যে-সকল ধর্ম ছিল, বর্তমানে যেগুলি বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে যেগুলি আসিবে—সবগুলিই বিশ্বাস করি। আমাদের আরও বিশ্বাস যে, ধর্মসমূহকে শুধু সহ্য করা নয়, আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করা কতর্ব্য।

স্থূল জড় জগতে আমরা দেখিতে পাই—বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। কোন কিছুর প্রসারণ থামিয়া গেলে উহার জীবনেরও অবসান ঘটে। নৈতিক ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করিলে বলিতে পারা যায়—যদি কেহ বাঁচিতে চায়, তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে। ভালবাসা রুদ্ধ হইলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রেমই হইল মানব-প্রকৃতি। তুমি উহাকে কিছুতেই এড়াইতে পার না, কেননা উহাই জীবনের একমাত্র নিয়ম। অতএব আমাদের কর্তব্য ভালবাসার জন্যই ভগবানকে ভালবাসা, কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন করা, কাজের জন্যই কাজ করা। অন্য কোন প্রত্যাশা যেন আমাদের না থাকে। জানিতে হইবে যে, মানুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ, মানুষই ভগবানের প্রকৃত মন্দির।

‘ব্রুকলিন ডেলী ঈগল্’, ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৯৪

মহম্মদীয়, বৌদ্ধ এবং ভারতের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মতগুলির উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন যে, হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম বেদের আপ্তবাণী হইতে লাভ করিয়াছেন। বেদের মতে সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। মানুষ দেহধারী আত্মা। দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা অবিনাশী। দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মা থাকিয়া যাইবেন। আত্মা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন নাই, কেননা উৎপত্তি অর্থে কতকগুলি জিনিষের মিলন, আর যাহা কিছু সম্মিলিত, ভবিষ্যতে তাহার বিশ্লেষও সুনিশ্চিত। অতএব আত্মার উদ্ভব স্বীকার করিলে উহার লয়ও অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য বলা হয়, আত্মার উৎপত্তি নাই। যদি বল, আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কোন কথা আমরা স্মরণ করিতে পারি না কেন, তাহার ব্যাখ্যা সহজ। আমরা যাহাকে বিষয়ের জ্ঞান বলি, তাহা আমাদের মনঃসমুদ্রের একান্তই উপরকার ব্যাপার। মনের গভীরে আমাদের সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রহিয়াছে।

একটা স্থায়ী কিছু অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা মানুষের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। মন, বুদ্ধি—বস্তুতঃ সারা বিশ্বপ্রকৃতিই তো পরিবর্তনশীল। এমন কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা, যাহা অসীম অনন্ত—এই প্রশ্ন লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। এক দার্শনিক সম্প্রদায়—বর্তমান বৌদ্ধগণ যাহার প্রতিনিধি—বলিতেন, যাহা কিছু পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তুনিচয়ের উপর নির্ভর করে; মানুষ একটি স্বাধীন সত্তা—এই ধারণা ভ্রম। পক্ষান্তরে ভাববাদীরা বলেন, প্রত্যেকেই এক-একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান এই যে, প্রকৃতি অন্যোন্য-নির্ভরতা ও স্বতন্ত্রতা, বাস্তবতা ও ভাব-সত্তা—এই উভয়ের সংমিশ্রণ। পারস্পরিক নির্ভরতার প্রমাণ এই যে, আমাদের শরীরের গতিসমূহ আমাদের মনের অধীন, মন আবার খ্রীষ্টানরা যাহাকে 'আত্মা' বলে, সেই চৈতন্যসত্তা দ্বারা চালিত। মৃত্যু একটি পরিবর্তন মাত্র। মৃত্যুর পর অন্য লোকে গিয়া যে-আত্মারা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর যাঁহারা এই পৃথিবীতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্য-সত্তার দিক্ দিয়া কোন পার্থক্য নাই। সেইরূপ অপর লোকে নিম্নগতি-প্রাপ্ত আত্মারাও এখানকার অন্যান্য আত্মার সহিত অভিন্ন। প্রত্যেক মানুষই স্বরূপতঃ পূর্ণ সত্তা। অন্ধকারে বসিয়া 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া পরিতাপ করিলে কোন লাভ নাই। বরং দেশলাই আনিয়া আলো জ্বালিলে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূর হয়। সেইরূপ 'আমাদের শরীর সীমাবদ্ধ, আমাদের আত্মা মলিন' বলিয়া বসিয়া বসিয়া অনুশোচনা নিস্ফল। তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে যদি আবাহন করি, সংশয়ের অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ। খ্রীষ্টানরা হিন্দুদের নিকট শিখিতে পারেন, হিন্দুরাও খ্রীষ্টানদের নিকট।

বক্তা বলেনঃ তোমাদের সন্তানদের শিখাও যে, ধর্ম হইল একটি প্রত্যক্ষ বস্তু, নেতিবাচক কিছু নয়। ইহা মানুষের শিখান বুলি নয়, ইহা হইল জীবনের একটি বিস্তার। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটি মহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা অনবরত বিকশিত হইতে চাহিতেছে। এই বিকাশের নামই ধর্ম। প্রত্যেকটি শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কতকগুলি পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া আসে। আমরা আমাদের মধ্যে যে স্বতন্ত্রতার ভাব অনুভব করি, উহা হইতে বুঝা যায় যে, শরীর ও মন ছাড়া আমাদের মধ্যে অপর একটি সত্য রহিয়াছে। শরীর ও মন পরাধীন। কিন্তু আমাদের আত্মা স্বাধীন সত্তা। উহাই

আমাদের ভিতরকার মুক্তির ইচ্ছা সৃষ্টি করিতেছে। আমরা যদি স্বরূপতঃ মুক্ত না হইতাম, তাহা হইলে আমরা জগৎকে সৎ ও পূর্ণ করিয়া তুলিবার আশা পোষণ করিতে পারিতাম কি? আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ি। আমরা এখন যাহা, তাহা আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। ইচ্ছা করিলে আমরা আমাদিগকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে পারি। আমরা বিশ্বপিতা ভগবানকে বিশ্বাস করি। তিনি তাঁহার সন্তানদের জনক ও পালয়িতা—সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্, তোমরা যেমন ব্যক্তি-ঈশ্বরকে স্বীকার কর, আমরাও ঐরূপ করি। কিন্তু আমরা ব্যক্তি-ঈশ্বরের পরেও যাইতে চাই, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের নির্বিশেষ সত্তার সহিত আমরা স্বরূপতঃ এক। অতীতে যেসব ধর্ম হইয়াছে, বর্তমানে যেগুলি আছে এবং ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম উদ্ভূত হইবে সবগুলির উপরই আমাদের শ্রদ্ধা। ধর্মের প্রত্যেক অভিব্যক্তির প্রতি হিন্দু মাথা নত করেন, কেননা জগতে কল্যাণকর আদর্শ হইল গ্রহণ—বর্জন নয়। সকল সুন্দর বর্ণের ফুল দিয়া আমরা তোড়া তৈরী করিয়া বিশ্বস্রষ্টা ভগবানকে উপহার দিব। তিনি যে আমাদের একান্ত আপনার জন। ভালবাসার জন্যই আমরা তাঁহাকে ভালবাসিব, কর্তব্যের জন্যই তাঁহার প্রতি আমাদের কর্তব্য সাধিব, পূজার জন্যই আমরা তাঁহার পূজা করিব।

ধর্মগ্রন্থসমূহ ভালই, তবে ঐগুলি শুধু মানচিত্রের মত। ধর একটি বই-এ লেখা আছে, বৎসরে এত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। একজন যদি আমাকে বইটি নিংড়াইতে বলেন, ঐরূপ করিয়া এক ফোঁটাও জল পাইব না। বই শুধু বৃষ্টির ধারণাটি দেয়; ঠিক সেইরূপ শাস্ত্র, মন্দির, গীর্জা প্রভৃতি আমাদিগকে পথের নির্দেশ দেয় মাত্র। যতক্ষণ উহারা আমাদিগকে ধর্মপথে আগাইয়া যাইতে সাহায্য করে, ততক্ষণ উহারা হিতকর। বলিদান, নতজানু হওয়া, স্তোত্রপাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণ—এসব ধর্মের লক্ষ্য নয়। আমরা যখন যীশুখ্রীষ্টকে সামনাসামনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব, তখনই আমাদের পূর্ণতার উপলব্ধি হইবে। পূর্বোক্ত ক্রিয়াকলাপ যদি আমাদিগকে সেই পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে, তবেই উহারা ভাল। শাস্ত্রের কথা বা উপদেশ আমাদের উপকারে আসিতে পারে। কলম্বাস এই মহাদেশ আবিষ্কার করিবার পর দেশে ফিরিয়া গিয়া স্বদেশবাসীকে নূতন পৃথিবীর সংবাদ দিলেন। অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, নিজেরা গিয়া খুঁজিয়া দেখ।

আমরাও সেইরূপ শাস্ত্রের উপদেশ পড়িবার পর যদি নিজেরা সাধনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত সত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা যে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করি, তাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না।

বক্তৃতার পর বক্তাকে যে-কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার অভিমত জানিবার সুযোগ উপস্থিত সকলকে দেওয়া হইয়াছিল। অনেকে এই সুযোগ কাজে লাগাইয়াছিলেন।

৪৬. নারীত্বের আদর্শ

‘ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন’, ২১ জানুআরী, ১৮৯৫

‘এথিক্যাল এসোসিয়েশন’-এর সভাপতি ডক্টর জেন্‌স্‌ স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় অংশতঃ বলেনঃ

কোন জাতির বস্তিতে উৎপন্ন জিনিষ ঐ জাতিকে বিচার করিবার পরিমাপক নয়। পৃথিবীর সকল আপেল গাছের তলা হইতে কেহ পোকায় খাওয়া সমস্ত পচা আপেল সংগ্রহ করিয়া উহাদের প্রত্যেকটিকে লইয়া এক একখানি বই লিখিতে পারে, তবুও আপেল গাছের সৌন্দর্য এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাহার কিছুই জানা নাই, এমনও সম্ভব। জাতির মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারাই জাতিকে যথার্থ বিচার করা চলে। যাহারা পতিত, তাহারা তো নিজেরাই একটি শ্রেণীবিশেষ। অতএব কোন একটি রীতিকে বিচার করিবার সময় উহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এবং আদর্শ দ্বারাই বিচার করা শুধু সমীচীন নয়, ন্যায্য ও নীতিসঙ্গত।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম জাতি—ভারতীয় আর্যগণের নিকট নারীত্বের আদর্শ অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। আর্যজাতিতে পুরুষ এবং নারী উভয়েই ধর্মাচার্য হইতে পারিতেন। বেদের ভাষায় স্ত্রী ছিলেন স্বামীর সহধর্মিণী১০ অর্থাৎ ধর্মসঙ্গিনী। প্রত্যেক পরিবারে একটি যজ্ঞবেদী থাকিত। বিবাহের সময় উহাতে যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইত, উহা মৃত্যু পর্যন্ত জাগাইয়া রাখা হইত। দম্পতির একজন মারা গেলে উহার শিখা হইতে

চিতাগ্নি জ্বালা হইত। স্বামী এবং স্ত্রী একত্র গৃহের যজ্ঞাগ্নিতে প্রত্যহ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেন। পত্নীকে ছাড়িয়া পতির একা যজ্ঞের অধিকার ছিল না, কেননা পত্নীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গ মনে করা হইত। অবিবাহিত ব্যক্তি যাজ্ঞিক হইতে পারিতেন না। প্রাচীন রোম ও গ্রীসেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল।

কিন্তু একটি স্বতন্ত্র পৃথক্ পুরোহিত-শ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতির ভিতর নারীর ধর্মকৃত্যে সমানাধিকার পিছনে হটিয়া গিয়াছিল। সেমিটিক রক্তসম্ভূত অ্যাসিরীয় জাতির ঘোষণা প্রথমে শোনা গেলঃ কন্যার কোন স্বাধীন মত থাকিবে না, বিবাহের পরও তাহাকে কোন অধিকার দেওয়া হইবে না। পারসীকরা এই মত বিশেষভাবে গ্রহণ করিল, পরে তাহাদের মাধ্যমে উহা রোম ও গ্রীসে পৌঁছিল এবং সর্বত্র নারীজাতির উন্নতি ব্যাহত হইতে লাগিল।

আর একটি ব্যাপারও এই ঘটনার জন্য দায়ী—বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন। প্রথমে পারিবারিক নিয়ম ছিল জননীর কর্ত্রীত্ব অর্থাৎ মাতা ছিলেন পরিবারের কেন্দ্র। কন্যারা তাঁহার স্থান অধিকার করিত। ইহা হইতে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহরূপ আজব প্রথার উদ্ভব হয়। অনেক সময় পাঁচ বা ছয় ভ্রাতা একই স্ত্রীকে বিবাহ করিত। এমন কি বেদেও ইহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। নিঃসন্তান অবস্থায় কোন পুরুষ মারা গেলে তাঁহার বিধবা পত্নী সন্তান না হওয়া পর্যন্ত অপর কোন একজন পুরুষের সহিত বাস করিতে পারিতেন। সন্তানদের দাবী কিন্তু ঐ পুরুষের থাকিত না। বিধবার মৃত স্বামীই সন্তানের পিতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। পরবর্তী কালে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রচলন হয়। বর্তমানকালে অবশ্য উহা নিষিদ্ধ।

কিন্তু এই-সকল অস্বাভাবিক অভিব্যক্তির পাশাপাশি ব্যক্তিগত পবিত্রতার একটি প্রগাঢ় ভাব জাতিমানসে দেখা দিতে থাকে। এতৎসম্পর্কিত বিধানগুলি খুবই কঠোর ছিল। প্রত্যেক বালক বা বালিকাকে গুরুগৃহে পাঠান হইত। বিশ বা ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত উহারা সেখানে বিদ্যাচর্চায় ব্যাপৃত থাকিত। চরিত্রে লেশমাত্র অশুচি ভাব দেখা গেলে প্রায় নিষ্ঠুরভাবেই তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত। ভারতীয় জাতির হৃদয়ে এই ব্যক্তিগত

শুচিতার ভাব এত গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে, উহা যেন একটি বাতিক বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানগণের চিতো (চিতোর)-অবরোধের সময় ইহার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে পুরুষরা নগরটি অনেকক্ষণ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন নগরীর নারীগণ বাজারে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিল। শত্রুপক্ষ নগর-দ্বার ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিতেই ৭৪,৫০০ কুল-ললনা একসঙ্গে ঐ কুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মবিসর্জন দিল। এই মহৎ দৃষ্টান্তটি ভারতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। চিঠির খামের উপর ৭৪। ।০ সংখ্যাটি লিখিয়া দেওয়ার রীতি আছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যদি কেহ বেআইনীভাবে ঐ চিঠিটি পড়ে, তাহা হইলে যে মহাপাপ হইতে বাঁচিবার জন্য চিতোরের মহাপ্রাণা নারীকুলকে অগ্নিতে আত্মাহূতি দিতে হইয়াছিল, ঐরূপ অপরাধে সে অপরাধী হইবে।

ইহার (বৈদিক যুগের) পর হইল সন্ন্যাসীদের যুগ, যাহা আসে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সহিত। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিয়াছিল—গৃহত্যাগী যতিরাই শুধু 'নির্বাণে'র অধিকারী। নির্বাণ হইল কতকটা খ্রীষ্টানদের স্বর্গরাজ্যের মত। এই শিক্ষার ফলে সারা ভারত যেন সন্ন্যাসীদের একটি বিরাট মঠে পরিণত হইল। সকল মনোযোগ নিবদ্ধ রহিল শুধু একটি মাত্র লক্ষ্যে—একটি মাত্র সংগ্রামে—কি করিয়া পবিত্র থাকা যায়। স্ত্রীলোকের উপর সকল দোষ চাপান হইল। এমন কি চলতি হিতবচনে পর্যন্ত নারী হইতে সতর্কতার কথা ঢুকিয়া গেল। যথাঃ নরকের দ্বার কি? এই প্রশ্নটি সাজাইয়া উত্তরে বলা হইলঃ 'নারী'। আর একটিঃ এই মাটির সহিত আমাদের বাঁধিয়া রাখে কোন্ শিকল?—'নারী'। অপর একটিঃ অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ কে?—'যে নারী দ্বারা প্রবঞ্চিত।'

পাশ্চাত্যের মঠসমূহেও অনুরূপ ধারণা দেখা যায়। সন্ন্যাস-প্রথার পরিবিস্তার সব সময়েই স্ত্রীজাতির অবনতি সূচিত করিয়াছে।

কিন্তু অবশেষে নারীত্বের আর একটি ধারণা উদ্ভূত হইল। পাশ্চাত্যে এই ধারণা রূপ নিল পত্নীর আদর্শে, ভারতে জননীর আদর্শে। এই পরিবর্তন শুধু ধর্মযাজকগণের দ্বারা

আসিয়াছিল, এরূপ মনে করিও না। আমি জানি, জগতে যাহা কিছু মহৎ ঘটে, ধর্মযাজকেরা তাহার উদ্যোক্তা বলিয়া দাবী করে, কিন্তু এ-দাবী যে ন্যায্য নয়, নিজে একজন ধর্মপ্রচারক হইয়া এ-কথা বলিতে আমার সঙ্কোচ নাই। জগতের সকল ধর্মগুরুর উদ্দেশ্যে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বলিতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্যে নারী-প্রগতি ধর্মের মাধ্যমে আসে নাই। জন স্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ব্যক্তিরা এবং বিপ্লবী ফরাসী দার্শনিকরাই ইহার জনয়িতা। ধর্ম সামান্য কিছু করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সবটা নয়। বেশী কথা কি, আজিকার দিনেও এশিয়া-মাইনরে খ্রীষ্টান বিশপরা উপপত্নী-গোষ্ঠী রাখেন!

এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি যে মনোভাব দেখা যায়, উহাই খ্রীষ্টধর্মের আদর্শানুগ। সামাজিক ও মানসিক উন্নতির বিচারে পাশ্চাত্যদেশীয় ভগিনীগণ হইতে মুসলমান নারীর পার্থক্য বিপুল। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না—মুসলমান নারী অসুখী, কেননা বাস্তবিকই তাহাদের কোন কষ্ট নাই। ভারতে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া নারী সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এদেশে কোন ব্যক্তি তাহার পত্নীকে সম্পত্তির অধিকার নাও দিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষের স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি স্ত্রীর প্রাপ্য—ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো সম্পূর্ণভাবে, স্থাবর সম্পত্তি জীবিতকাল পর্যন্ত।

ভারতে পরিবারের কেন্দ্র হইলেন মা। তিনিই আমাদের উচ্চতম আদর্শ। আমরা ভগবানকে বিশ্বজননী বলি, আর গর্ভধারিণী মাতা হইলেন সেই বিশ্বজননীরই প্রতিনিধি। একজন মহিলা-ঋষিই প্রথম ভগবানের সহিত ঐকাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন। বেদের একটি প্রধান সূক্তে তাঁহার অনুভূতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের ঈশ্বর সগুণ এবং নির্গুণ দুই-ই। নির্গুণ যেন পুরুষ, সগুণ প্রকৃতি। তাই আমরা বলি 'যে হস্তদ্বয় শিশুকে দোল দেয়, তাহাতেই ভগবানের প্রথম প্রকাশ।' যে-জাতক ঈশ্বর আরাধনার ভিতর দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই হইল আর্য; আর অনার্য সেই, যাহার জন্ম হইয়াছে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মাধ্যমে।

প্রাগ্‌জন্ম-প্রভাব-সম্বন্ধীয় মতবাদ বর্তমানকালে ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েই বলিতেছে, 'নিজেকে শুচি এবং শুদ্ধ রাখ।' ভারতবর্ষে শুচিতার ধারণা এত গভীর যে, আমরা এমন কি বিবাহকে পর্যন্ত ব্যভিচার বলিয়া থাকি, যদি না বিবাহ ধর্মসাধনায় পরিণত হয়। প্রত্যেক সৎ হিন্দুর সহিত আমিও বিশ্বাস করি যে, আমার জন্মদাত্রী মাতার চরিত্র নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক, এবং সেইজন্য আমার মধ্যে আজ যাহা কিছু প্রশংসনীয়, তাহা তাঁহারই নিকট পাওয়া। ভারতীয় জাতির জীবন-রহস্য ইহাই—এই পবিত্রতা।

৪৭. প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম

'ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন', ৪ ফেব্রুআরী, ১৮৯৫

এথিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডক্টর জেন্‌স্‌ স্বামী বিবেকানন্দকে বক্তৃতামঞ্চে উপস্থাপিত করিলে তিনি তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করেন। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছেঃ

বৌদ্ধধর্ম-প্রসঙ্গে হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। যীশুখ্রীষ্ট যেমন প্রচলিত য়াহুদী ধর্মের প্রতিপক্ষতা করিয়াছিলেন, বুদ্ধও সেইরূপ ভারতবর্ষের তৎকালীন ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। খ্রীষ্টকে তাঁহার দেশবাসীরা অস্বীকার করিয়াছিল, বুদ্ধ কিন্তু স্বদেশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। যে-সব মন্দিরের দ্বারদেশে বুদ্ধ পৌরোহিত্য-ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই সকল মন্দিরেই আজ তাঁহার পূজা হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নামে যে মতবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, উহাতে হিন্দুদের আস্থা নাই। বুদ্ধ যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন হিন্দুরা তাহা শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বৌদ্ধরা যাহা প্রচার করে, তাহা গ্রহণ করিতে তাহারা রাজী নয়। কারণ বুদ্ধের বাণী নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া বহু বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। ঐ রঞ্জিত ও বিকৃত বাণীর ভারতীয় ঐতিহ্যের সহিত খাপ খাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

বৌদ্ধধর্মকে পুরাপুরি বুঝিতে হইলে উহা যাহা হইতে উদ্ভূত, আমাদিগকে সেই মূল ধর্মটির দিকে অবশ্যই ফিরিয়া দেখিতে হইবে। বৈদিক গ্রন্থগুলির দুটি ভাগ। প্রথম–কর্মকাণ্ড১১, যাহাতে যাগযজ্ঞের কথা আছে, আর দ্বিতীয় হইল বেদান্ত–যাহা যাগযজ্ঞের নিন্দা করে, দান ও প্রেম শিক্ষা দেয়, মৃত্যুকে বড় করিয়া দেখায় না। বেদবিশ্বাসী যে সম্প্রদায়ের বেদের যে অংশে প্রীতি, সেই অংশই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। অবৈদিকদের মধ্যে চার্বাকপন্থী বা ভারতীয় জড়বাদীরা বিশ্বাস করিত যে, সব কিছু হইল জড়; স্বর্গ, নরক, আত্মা বা ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। দ্বিতীয় একটি সম্প্রদায়–জৈনগণও নাস্তিক, কিন্তু অত্যন্ত নীতিবাদী। তাহারা ঈশ্বরের ধারণাকে অস্বীকার করিত, কিন্তু আত্মা মানিত। আত্মা অধিকতর পূর্ণতার অভিব্যক্তির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়কে অবৈদিক বলা হইত। তৃতীয় একটি সম্প্রদায় বৈদিক হইলেও ব্যক্তি-ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। তাহারা বলিত বিশ্বজগতের সব কিছুর জনক হইল পরমাণু বা প্রকৃতি।

অতএব দেখা যাইতেছে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের চিন্তা-জগৎ ছিল বিভক্ত। তাঁহার ধর্মের নির্ভুল ধারণা করিবার জন্য আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ প্রয়োজনীয়–উহা হইল সেই সময়কার জাতি-প্রথা। বেদ শিক্ষা দেয় যে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ; যিনি সমাজের সকলকে রক্ষা করেন, তিনি খোক্ত (ক্ষত্রিয়) আর যিনি ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া অন্নসংস্থান করেন, তিনি বিশ (বৈশ্য)। এই সামাজিক বৈচিত্র্যগুলি পরে অত্যন্ত ধরাবাঁধা কঠিন জাতিভেদের ছাঁচে পরিণতি অর্থাৎ অবনতি লাভ করে এবং ক্রমে দৃঢ়-গঠিত সুসম্বদ্ধ একটি পৌরোহিত্য-শাসন সমগ্র জাতির কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন ঠিক এই সময়েই। অতএব তাঁহার ধর্মকে ধর্মবিষয়ক ও সামাজিক সংস্কারের একটি চরম প্রয়াস বলা যাইতে পারে।

সেই সময়ে দেশের আকাশ-বাতাস বাদ-বিতণ্ডায় ভরিয়া আছে। বিশ হাজার অন্ধ পুরোহিত দুই কোটি পরস্পর-বিবদমান অন্ধ মানুষকে পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে! এইরূপ সঙ্কটকালে বুদ্ধের ন্যায় একজন জ্ঞানী পুরুষের প্রচার-কার্য অপেক্ষা জাতির পক্ষে

বেশী প্রয়োজনীয় আর কি থাকিতে পারে? তিনি সকলকে শুনাইলেন—'কলহ বন্ধ কর, পুঁথিপত্র তুলিয়া রাখ, নিজের পূর্ণতাকে বিকাশ করিয়া তোল।' জাতি-বিভাগের মূল তথ্যটির প্রতিবাদ বুদ্ধ কখনও করেন নাই, কেননা উহা সমাজজীবনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতারই অভিব্যক্তি এবং সব সময়েই মূল্যবান্। কিন্তু যাহা বংশগত বিশেষ সুবিধার দাবী করে, বুদ্ধ সেই অবনত জাতিপ্রথার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে তিনি বলিলেন, 'প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা লোভ, ক্রোধ এবং পাপকে জয় করিয়া থাকেন। তোমরা কি ঐরূপ করিতে পারিয়াছ? যদি না পারিয়া থাক, তাহা হইলে আর ভণ্ডামি করিও না। জাতি হইল চরিত্রের একটি অবস্থা, উহা কোন কঠোর গণ্ডীবদ্ধ শ্রেণী নয়। যে-কেহ ভগবানকে জানে ও ভালবাসে, সে-ই যথার্থ ব্রাহ্মণ।' যাগ-যজ্ঞ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিলেন, 'যাগ-যজ্ঞ আমাদিগকে পবিত্র করে, এমন কথা বেদে কোথায় আছে? উহা হয়তো দেবতাগণকে সুখী করিতে পারে, কিন্তু আমাদের কোন উন্নতি সাধন করে না। অতএব এই-সব নিষ্ফল আড়ম্বরে ক্ষান্তি দিয়া ভগবান্‌কে ভালবাস এবং পূর্ণতা লাভ করিবার চেষ্টা কর।'

পরবর্তী কালে বুদ্ধের এই সকল শিক্ষা লোকে বিস্মৃত হয়। ভারতের বাহিরে এমন অনেক দেশে উহা প্রচারিত হয়, যেখানকার অধিবাসীদের এই মহান্ সত্যসমূহ গ্রহণের যোগ্যতা ছিল না। এই-সকল জাতির বহুতর কুসংস্কার ও কদাচারের সহিত মিশিয়া বুদ্ধবাণী ভারতে ফিরিয়া আসে এবং কিম্ভূতকিমাকার মতসমূহের জন্ম দিতে থাকে। এইভাবে উঠে শূন্যবাদী সম্প্রদায়, যাহাদের মতে বিশ্বসংসার, ভগবান্ এবং আত্মার কোন মূলভিত্তি নাই। সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। ক্ষণকালের সম্ভোগ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করিত না। ইহার ফলে এই মত পরে অতি জঘন্য কদাচারসমূহ সৃষ্টি করে। যাহা হউক, উহা তো বুদ্ধের শিক্ষা নয়, বরং তাঁহার শিক্ষার ভয়াবহ অধোগতি মাত্র। হিন্দুজাতি যে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই কুশিক্ষাকে দূর করিয়া দিয়াছিল, এজন্য তাহারা অভিনন্দনীয়।

বুদ্ধের প্রত্যেকটি বাণী বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত-গ্রন্থে এবং অরণ্যের মঠসমূহে লুক্কায়িত সত্যগুলিকে যাঁহারা সকলের গোচরীভূত করিতে চাহিয়াছেন, বুদ্ধ সেই-সকল

সন্ন্যাসীর একজন। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না যে, জগৎ এখনও ঐ-সকল সত্যের জন্য প্রস্তুত। লোকে এখনও ধর্মের নিম্নতর অভিব্যক্তিগুলিই চায়, যেখানে ব্যক্তি-ঈশ্বরের উপদেশ আছে। এই কারণেই মৌলিক বৌদ্ধধর্ম জনগণের চিত্তকে বেশীদিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিব্বত ও তাতার দেশগুলি হইতে আমদানী বিকৃত আচারসমূহের প্রচলন যখন হইল, তখনই জনগণ দলে দলে বৌদ্ধধর্মে ভিড়িয়াছিল। মৌলিক বৌদ্ধধর্ম আদৌ শূন্যবাদ নয়। উহা জাতিভেদ ও পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম প্রচেষ্টা মাত্র। বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে প্রথম মূক ইতর প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ঘোষণা করে এবং মানুষে মানুষে বিভেদ-সৃষ্টিকারী আভিজাত্য প্রথাকে ভাঙিয়া দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি চিত্র উপস্থিত করিয়া। তাঁহার ভাষায় বুদ্ধ ছিলেন 'এমন একজন মহাপুরুষ, যাঁহার মনে একটি মাত্র চিন্তাও উঠে নাই বা যাঁহার দ্বারা একটি মাত্র কাজও সাধিত হয় নাই, যাহা মানুষের হিতসাধন ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে চালিত। তাঁহার মেধা এবং হৃদয় উভয়ই ছিল বিরাট—তিনি সমুদয় মানবজাতি এবং প্রাণিকুলকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং কি উচ্চতম দেবদূত, কি নিম্নতম কীটটির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।' বুদ্ধ কিভাবে জনৈক রাজার যজ্ঞে বলিদানের উদ্দেশ্যে নীত একটি মেষযূথকে বাঁচাইবার জন্য নিজেকে যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, বক্তা প্রথমে তাহা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি চিত্রিত করেন—দুঃখসন্তপ্ত মানুষের ক্রন্দনে ব্যথিত এই মহাপুরুষ কিভাবে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করেন, পরে তাঁহার শিক্ষা ভারতে সর্বজনীনভাবে যখন গৃহীত হইল, তখন কিভাবে তিনি জনৈক নীচকুলোদ্ভব পারিয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তৎপ্রদত্ত শূকর-মাংস আহার করেন এবং উহার ফলে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।

৪৮. জগতে ভারতের দান

'ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন', ২৭ ফেব্রুআরী, ১৮৯৫

সোমবার রাত্রে ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পায়ারপণ্ট এবং ক্লিণ্টন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে লং আইল্যাণ্ড হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি হলে হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ‘জগতে ভারতের দান’ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃসংখ্যা বেশীই ছিল।

বক্তা তাঁহার স্বদেশের আশ্চর্য সৌন্দর্যের কথা বলেন—যে দেশ নীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আদিম বিকাশ-ভূমি, যে-দেশের পুত্রদের চরিত্রবত্তা ও কন্যাদের ধর্মনিষ্ঠার কথা বহু বৈদেশিক পর্যটক কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর বক্তা বিশ্বজগতে ভারত কি কি দিয়াছে, তাহা দ্রুতগতিতে বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের দানপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, খ্রীষ্টধর্মের উপর ভারত প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যীশুখ্রীষ্টের উপদেশগুলির মূল উৎসের অনুসন্ধান করিলে দেখান যাইতে পারে, উহা বুদ্ধের বাণীর ভিতর রহিয়াছে।

ইওরোপীয় এবং আমেরিকান গবেষকদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বক্তা বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের মধ্যে বহু সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। যীশুর জন্ম, গৃহত্যাগান্তে নির্জন বাস, অন্তরঙ্গ শিষ্যসংখ্যা এবং তাঁহার নৈতিক শিক্ষা তাঁহার আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্বেকার বুদ্ধের জীবনের ঘটনার মতই। বক্তা জিজ্ঞাসা করেন, এই মিল কি শুধু একটি আকস্মিক ব্যাপার অথবা বুদ্ধের ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের একটি পূর্বতন আভাস? মনে হয়, পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মনীষী দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু এমনও কোন কোন পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নির্ভীকভাবে বলেন, খ্রীষ্টধর্ম সাক্ষাৎ বৌদ্ধধর্ম হইতে প্রসূত, যেমন খ্রীষ্টধর্মের প্রথম বিরুদ্ধবাদী শাখা মনিকাই-বাদকে (Monecian heresy) এখন সর্বসম্মতভাবে বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায়ের শিক্ষা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম যে বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। ভারত-সম্রাট্ অশোকের সম্প্রতি আবিষ্কৃত শিলালিপিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তিনি গ্রীক রাজাদের সহিত সন্ধিপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যে-সব অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে, সম্রাট্ অশোকের প্রেরিত প্রচারকগণ

সেই-সকল স্থানে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, খ্রীষ্টধর্মে কি করিয়া ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ এবং ভারতের নীতিতত্ত্ব আসিল এবং কেনই বা আমাদের দেশের মন্দিরের পূজার্চনার সহিত তোমাদের ক্যাথলিক গীর্জার 'মাস্'১২ আবৃত্তি এবং 'আশীর্বাদ'১৩ প্রভৃতি ধর্মকৃত্যের এত সাদৃশ্য। খ্রীষ্টধর্মের বহু আগে বৌদ্ধধর্মে এই-সকল জিনিষ প্রচলিত ছিল। এখন এই তথ্যগুলির উপর নিজেদের বিচার-বিবেচনা তোমরা প্রয়োগ করিয়া দেখ। আমরা হিন্দুরা তোমাদের ধর্ম প্রাচীনতর, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি, যদি যথেষ্ট প্রমাণ তোমরা উপস্থিত করিতে পার। আমরা তো জানি যে, তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ। সার উইলিয়ম হাণ্টারের মতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশী। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়গৌরবস্বরূপ মিশ্রগণিত—ইহাদের সবগুলিই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয়; বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ সংখ্যাদশকও ভারতমনীষার সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (decimal) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যন্ত অপর যে কোন জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে রহিয়াছি। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি। ইওরোপে উহা প্রথম আসে মাত্র একাদশ শতাব্দীতে। ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার ভিত্তি। এই ভাষাগুলি বিকৃত উচ্চারণ-বিশিষ্ট সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক অপর যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য। জার্মানীর শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের শকুন্তলা-নাটক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলিয়াছেন, উহাতে 'স্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত।' 'ঈসপ্‌স্ ফেব্‌ল্‌স্' নামক প্রসিদ্ধ গল্পমালা ভারতেরই দান, কেননা ঈসপ্ একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার বই-এর উপাদান লইয়াছিলেন। 'এরেবিয়ান নাইটস্' নামক বিখ্যাত কথাসাহিত্য এমন কি 'সিণ্ডারেলা' ও 'বরবটির ডাঁটা' গল্পেরও উৎপত্তি ভারতেই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল রঙ উৎপাদন করে এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার-নির্মাণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায়। চিনি ভারতে প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজী 'সুগার' কথাটি সংস্কৃত শর্করা হইতে উৎপন্ন। সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাবা তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তুতঃ সব দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বুভুক্ষু ইওরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইতে থাকে এবং পরোক্ষভাবে এই ঘটনাই পরে আমেরিকা-আবিষ্কারের হেতু হয়।

এখন দেখা যাক—এই-সকলের পরিবর্তে জগৎ ভারতকে কি দিয়াছে। নিন্দা, অভিশাপ ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত-সন্তানদের রুধির-স্রোতের মধ্য দিয়া অপরে তাহার সমৃদ্ধির পথ করিয়া লইয়াছে ভারতকে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করিয়া এবং ভারতের পুত্রকন্যাগণকে দাসত্বে ঠেলিয়া দিয়া। আর এখন আঘাতের উপর অপমান হানা হইতেছে ভারতে এমন একটি ধর্ম প্রচার করিয়া, যাহা পুষ্ট হইতে পারে শুধু অপর সমস্ত ধর্মের ধ্বংসের উপর। কিন্তু ভারত ভীত নয়। সে কোন জাতির কৃপাভিখারী নয়। আমাদের একমাত্র দোষ এই যে, আমরা অপরকে পদদলিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে পারি না, আমরা বিশ্বাস করি—সত্যের অনন্ত মহিমায়। বিশ্বের নিকট ভারতের বাণী হইল—প্রথমতঃ তাহার মঙ্গলেচ্ছা। অহিতের প্রতিদানে ভারত দিয়া চলে হিত। এই মহৎ আদর্শের উৎপত্তি ভারতেই। ভারত উহা কার্যে পরিণত করিতে জানে। পরিশেষে ভারতের বাণী হইলঃ প্রশান্তি সাধুতা ধৈর্য ও মৃদুতা আখেরে জয়ী হইবেই। এক সময়ে যাহাদের পৃথিবীতে ছিল বিপুল অধিকার, সেই পরাক্রান্ত গ্রীক জাতি আজ কোথায়? তাহারা বিলুপ্ত। একদা যাহাদের বিজয়ী সৈন্যদলের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইত, সেই রোমান জাতিই বা

কোথায়? অতীতের গর্ভে। পঞ্চাশ বৎসরে যাহারা এক সময়ে অতলান্তিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, সেই আরবরাই বা আজ কোথায়? কোথায় সেই লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষের নিষ্ঠুর হত্যাকারী স্প্যানিয়ার্ডগণ? উভয় জাতিই আজ প্রায় বিলুপ্ত, তবে তাহাদের পরবর্তী বংশধরগণের ন্যায়পরতা ও দয়াধর্মের গুণে তাহারা সামূহিক বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবে, পুনরায় তাহাদের অভ্যুদয়ের ক্ষণ আসিবে। বক্তৃতার শেষে স্বামী বিবেকানন্দকে করতালি দ্বারা সাদরে অভিনন্দিত করা হয়। ভারতের রীতি-নীতি সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি প্রশ্নেরও উত্তর দেন। গতকল্যকার (২৫ ফেব্রুআরী) 'স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ান' পত্রিকায় ভারতবর্ষে বিধবাদের নির্যাতিত হওয়া লইয়া যে উক্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে, উহার তিনি স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ করেন।

বিবাহের পূর্বে নারীর নিজস্ব সম্পত্তি যদি কিছু থাকে, ভারতীয় আইন অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাতে তাঁহার অধিকার তো বজায় থাকিবেই, তা ছাড়া স্বামীর নিকট হইতে তিনি যাহা কিছু পাইয়াছিলেন এবং মৃত স্বামীর সাক্ষাৎ অপর কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাঁহার সম্পত্তিও বিধবার দখলে আসিবে। পুরুষের সংখ্যা-ন্যূনতার জন্য ভারতে বিধবারা ক্বচিৎ পুনরায় বিবাহ করেন।

বক্তা আরও উল্লেখ করেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকের সহমরণ-প্রথা এবং জগন্নাথের রথচক্রে আত্মবলিদান সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রমাণের জন্য তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে সার উইলিয়াম হাণ্টার প্রণীত 'ভারত সাম্রাজ্যের ইতিহাস' নামক পুস্তিকাটি দেখিতে বলেন।

৪৯. ভারতের বালবিধবাগণ

'ডেলী ঈগল্', ২৭ ফেব্রুআরী, ১৮৯৫

ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে হিষ্টরিক্যাল হল-এ হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সোমবার রাত্রে 'জগতে ভারতবর্ষের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তা যখন

মঞ্চের উপর উঠেন, তখন মঞ্চে প্রায় আড়াই শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ব্রুকলিন রমাবাঈ সার্কেল-এর সভাপতি মিসেস জেমস্ ম্যাক্‌কীন কয়েকদিন আগে 'ভারতবর্ষে বালবিধবাদের উপর দুর্ব্যবহার করা হয় না।'—বক্তার এই উক্তিটির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানটি ভারতে খ্রীষ্টমতানুগ সেবাকার্য করিয়া থাকে। বক্তার নিকট এই প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য শ্রোতৃবৃন্দের খুব আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভাষণে ঐ বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে একজন শ্রোতা ঐ প্রসঙ্গটি তুলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন—ঐ সম্পর্কে তাঁহার কি বলিবার আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, বালবিধবাদের প্রতি নির্যাতন বা কঠোর ব্যবহার করা হয়—এই সংবাদ সত্য নয়। তিনি আরও বলেনঃ ইহা ঠিকই যে কোন কোন হিন্দুর বিবাহ হয় খুব অল্প বয়সে। অনেকে কিন্তু বেশ পরিণত বয়সেই বিবাহ করে। কেহ কেহ বা আদৌই বিবাহ করে না। আমার পিতামহের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তিনি একেবারেই বালক। আমার পিতা বিবাহ করেন চৌদ্দ বৎসর বয়সে। আমার বয়স ত্রিশ বৎসর, আমি এখনও বিবাহ করি নাই। স্বামী মারা গেলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার বিধবা পত্নী পান। দরিদ্রের ঘরে বিধবার কষ্ট অন্যান্য দেশে যেমন, ভারতেও সেইরূপ। কখনও কখনও বৃদ্ধেরা বালিকা বিবাহ করে। এইরূপ স্বামী ধনী হইলে যত শীঘ্র মারা যায়, তাহার বিধবা স্ত্রীর পক্ষে ততই মঙ্গল। আমি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু বিধবাদের প্রতি যে রূপ নির্যাতনের কথা প্রচার করা হইতেছে, ঐরূপ একটিও দেখিতে পাই নাই। এক সময়ে আমাদের দেশে এক ধরনের ধর্মোন্মত্ততা ছিল। তখন কখনও কখনও বিধবারা মৃত পতির জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতেন। হিন্দু জনসাধারণ যে এই রীতি পছন্দ করিত, তাহা নয়, তবে উহা বন্ধ করিবার চেষ্টাও ছিল না। অবশেষে ব্রিটিশরা ভারত অধিকার করিলে ইহা নিষিদ্ধ হয়। সহমৃতা নারীকে সাধ্বী বলিয়া খুব সম্মান করা হইত। অনেক সময়ে তাঁহাদের স্মৃতিতে স্তম্ভাদি নির্মিত হইত।

৫০. হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি

'ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন', ৮ এপ্রিল, ১৮৯৫

গত রাত্রিতে ক্লিণ্টন এভিনিউ-স্থিত পউচ গ্যালারীতে ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েশনের একটি বিশেষ সভায় হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাই ছিল প্রধান কর্মসূচী। আলোচ্য বিষয় ছিলঃ 'হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি—ঐগুলির তাৎপর্য ও কদর্থ।' প্রশস্ত গ্যালারীটি একটি বৃহৎ জনতায় ভরিয়া গিয়াছিল।

পরিধানে প্রাচ্য পোষাক, উজ্জ্বল চক্ষু এবং মুখে প্রতিভার দীপ্তি লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্বদেশ, উহার অধিবাসী এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বক্তা বলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তিনি শুধু চান তাঁহার ও তাঁহার স্বদেশের প্রতি ন্যায়দৃষ্টি। তিনি ভাষণের প্রারম্ভে ভারত সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা উপস্থাপিত করিবেন। ভারত একটি দেশ নয়, মহাদেশ। যে-সব পর্যটক কখনও ভারতবর্ষে যান নাই, তাঁহারা উহার সম্বন্ধে অনেক ভুল মত প্রচার করিয়াছেন। ভারতে নয়টি পৃথক্ প্রধান ভাষা আছে এবং প্রাদেশিক উপভাষার সংখ্যা একশতেরও বেশী। বক্তা তাঁহার স্বদেশ সম্বন্ধে যাঁহারা বই লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এই-সব ব্যক্তির মস্তিষ্ক কুসংস্কার দ্বারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের একটি ধারণা যে, ইঁহাদের ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে প্রত্যেকটি লোক ভয়ানক শয়তান। হিন্দুদের দন্তধাবন-প্রণালীর অনেক সময়ে কদর্থ করা হইয়া থাকে। তাহারা মুখে পশুর লোম বা চামড়া ঢুকাইবার পক্ষপাতী নয় বলিয়া বিশেষ কয়েকটি গাছের ছোট ডাল দিয়া দাঁত পরিষ্কার করে। জনৈক পাশ্চাত্য লেখক এই জন্য লিখিয়াছেন, 'হিন্দুরা প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া একটি গাছ গিলিয়া ফেলে।' বক্তা বলেন যে, হিন্দুবিধবাদের জগন্নাথের রথচক্রের নীচে আত্মব

লিদানের রীতি কখনও ছিল না। এই গল্প যে কিভাবে চালু হইল, তাহা বুঝা ভার।

জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্যগুলি ছিল খুব ব্যাপক এবং চিত্তাকর্ষক। ভারতীয় জাতিপ্রথা উচ্চাবচ শ্রেণীতে বিভক্ত নয়। প্রত্যেকটি জাতি নিজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। জাতিপ্রথা কোন ধর্মকৃত্য নয়, উহা হইল বিভিন্ন কারিগরীর বিভাগ-ব্যবস্থা। স্মরণাতীত কাল হইতে উহা মানবসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। বক্তা ব্যাখ্যা করিয়া দেখান—কীভাবে সমাজে প্রথমে কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল। পরে চলিল প্রত্যেকটি শ্রেণীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন এবং বিবাহ ও পানাহারকে সীমাবদ্ধ করা হইল নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে।

হিন্দুগৃহে খ্রীষ্টান বা মুসলমানের উপস্থিতিতে কি প্রভাব হয়, বক্তা তাহা বর্ণনা করেন। কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি হিন্দুদের ঘরে ঢুকিলে ঘর অশুচি হইয়া যায়। বিধর্মী গৃহে আসিলে গৃহস্বামী প্রায়ই পরে স্নান করিয়া থাকেন। অন্ত্যজ জাতিদের প্রসঙ্গে বক্তা বলেন যে, উহারা সমাজে মেথরের কাজ, ঝাড়ুদারি প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে এবং উহারা গলিত মাংসভোজী। তিনি আরও বলেন যে, ভারত সম্বন্ধে যে-সকল পাশ্চাত্য লেখক বই লিখিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের এই-সকল নিম্নস্তরের লোকের সংস্পর্শেই আসিয়াছেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জীবনের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ঘটে নাই। জাতির নিয়ম-কানুন ভাঙিলে কি শাস্তি হয়, তাহা বক্তা বর্ণনা করেন। শাস্তি শুধু এই যে, নিয়মভঙ্গকারী যে-জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান ও পানাহার তাঁহার ও তাঁহার সন্তানগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই সম্পর্কে অন্য যে-সব ধারণা পাশ্চাত্যে প্রচারিত, তাহা অতিরঞ্জিত ও ভুল।

জাতিপ্রথার দোষ দেখাইতে গিয়া বক্তা বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ না দিয়া এই প্রথা জাতির কর্মজীবনে জড়তার সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহাতে জনগণের অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হইয়াছে। এই প্রথা সমাজকে পাশবিক রেষারেষি হইতে মুক্ত রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে উহা সামাজিক উন্নতি রুদ্ধ করিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করিয়া উহা প্রজাবৃদ্ধি ঘটাইয়াছে। জাতিপ্রথার সপক্ষে বক্তা বলেন যে, উহাই সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের একমাত্র কার্যকর আদর্শ। কাহারও আর্থিক অবস্থা জাতিতে তাহার উচ্চাবচ স্থানের

পরিমাপক নয়। জাতির মধ্যে প্রত্যেকেই সমান। বড় বড় সমাজ সংস্কারকগণের সকলেরই চিন্তায় একটি মস্ত ভুল হইয়াছিল। জাতিপ্রথার যথার্থ উৎপত্তি-সূত্র যে সমাজের একটি বিশিষ্ট পরিবেশ, উহা দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ধর্মের বিধিনিষেধই ঐ প্রথার জনক। বক্তা ইংরেজ ও মুসলমান শাসকগণের দেশকে বেয়নেট, গোলাবারুদ এবং তরবারির সাহায্যে সুসভ্য করিবার চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁহার মতে জাতিভেদ দূর করিতে হইলে সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক প্রণালীর ধ্বংস-সাধন একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, ইহা অপেক্ষা বরং বঙ্গোপসাগরের জলে সকলকে ডুবাইয়া মারা শ্রেয়ঃ। ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হইল তিনটি 'ব'—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রাণ্ডি। ইহারই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেণ্টে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাশিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে এবং বলিতেছে, 'আমরাও একটু সভ্যতা লইয়া আসি।' ইংলণ্ডের সভ্যতা বিস্তার কিন্তু চলিতেছেই।

সন্ন্যাসী বক্তা মঞ্চের উপর একদিক হইতে অপর দিকে পায়চারি করিতে করিতে হিন্দুদের প্রতি কিভাবে অবিচার করা হয়, ইহা বর্ণনা করিবার সময় খুব উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তাঁহার কথাও বেশ দ্রুত গতিতে চলে। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের কটাক্ষ করিয়া তিনি বলেন যে, তাহারা স্বদেশে ফিরিবে শ্যাম্পেন এবং বিজাতীয় নূতন ভাবে পুরাপুরি দীক্ষা লইয়া। বাল্যবিবাহকে নিন্দা করিবার এত ধুম কেন? না—সাহেবরা বলিয়াছে, উহা খারাপ। হিন্দুগৃহে শাশুড়ী পুত্রবধূকে যদি নিপীড়ন করে তো তাহার কারণ এই যে, পুত্র প্রতিবাদ করে না। বক্তা বলেন, বিদেশীরা যে-কোন সুযোগে হিন্দুদের উপর গালিবর্ষণ করিতে উন্মুখ, কেননা তাঁহাদের নিজেদের এত বেশী দোষ আছে যে, তাঁহারা উহা ঢাকা দিতে চান। তাঁহার মতে প্রত্যেক জাতিকে নিজের মুক্তিসাধন নিজেই করিতে হইবে, অন্য কেহ উহার সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারে না।

বিদেশী ভারত-বন্ধুদের প্রসঙ্গে বক্তা জিজ্ঞাসা করেন, আমেরিকায় ডেভিড হেয়ারের কথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা? ইনি ভারতে নারীদের জন্য প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং

জীবনের অধিকাংশ শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয় করেন। বক্তা অনেকগুলি ভারতীয় প্রবাদ-বাক্য শুনান। ঐগুলি আদৌ ইংরেজগণের প্রশংসাসূচক নয়। ভারতের জন্য একটি ব্যাকুল আবেদন প্রকাশ করিয়া তিনি বক্তৃতার সমাপ্তি করেন। তিনি বলেন, 'ভারত যতদিন তাহার নিজের প্রতি ও স্বধর্মের প্রতি খাঁটি থাকিবে, ততদিন কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞানহীন এই ভয়ানক পাশ্চাত্য যখন ভারতে ভণ্ডামি ও নাস্তিকতা রপ্তানি করে, তখনই ভারতের বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়। ঝুড়ি ঝুড়ি গালাগালি, গাড়ী-বোঝাই তিরস্কার এবং জাহাজ-ভর্তি নিন্দা না পাঠাইয়া অন্তহীন একটি প্রীতির স্রোত লইয়া আসা হউক। আসুন, আমরা সকলে মানুষ হই।'